ইচ্ছামতী

গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০১০

সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃগ্রীষ্ম সংখ্যা ২০১০........1

নববর্ষের উপহার........5

গ্রীষ্মের চিঠি: ছোট্ট রবির সাথে........7

উজ্জ্বল অধ্যায়ঃ পর্ব ৩........13

ছড়া-কবিতা........14

- ইচ্ছামতী........14
- দুই শেয়ালের গল্প........15
- প্যালার বুদ্ধি........16
- হরেক ডাক........17
- এলোপাথাড়ি- বনবাদাড়ি ছড়া........18

গল্প-স্বল্প........20

- ম্যাজিক........20
- কেকিকোকা, দ্য মুশকিল আসান........25
- হাতি শিকার........34
- নিনির সংসার........39

বিদেশী রূপকথা: ছোট্ট মেঘ........44

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ৭........47

মনের মানুষ: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী........52

পড়ে পাওয়া: টুনটুনি আর বিড়ালের কথা........54

দেশে-বিদেশে........57

- জয়পুর-গোলাপী শহর........57
- দৈত্য ক্যাক্টাসদের দেশে........68

ছবির খবর: পথের পাঁচালী........73

বেনহুর-হলিউড ধ্রুপদী ছবি........78

পরশমণি: শীত গরমের চক্কর........87

কমিক্স্ কাহিনী: প্রাণ ভরে........93

জানা-অজানা........95

- আলি, কোকো আর আমরা........95
- লোহারা........100

এক্কা-দোক্কা: খেলার দুনিয়ার খুচরো খবর........102

আঁকিবুকি........106

পালা-পার্বন........108

প্রথম পাতাঃগ্রীষ্ম সংখ্যা ২০১০

শুভ নববর্ষ! শুভ নববর্ষ!! শুভ নববর্ষ!!!

শুভ ১৪১৭। ভালো আছ তো? -ইচ্ছামতী আর চাঁদের বুড়ির তরফ থেকে তোমার জন্য প্রথমেই রইল নববর্ষের অনেক ভালবাসা। ভাবছো, পয়লা বৈশাখ তো কবেই চলে গেছে, আর চাঁদের বুড়ির এতদিন পরে মনে পড়লো শুভেচ্ছা জানানোর কথা? আহা...আমি জানি, একটু দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে কি? বাংলা নতুন বছরে তোমার সঙ্গে এই তো প্রথম দেখা হল, তাই না?

কি, একটু একটু রেগে আছো নাকি? ভাবছিলে তো, চাঁদের বুড়ি নির্ঘাত ভুলেই গেছে নিশ্চয়...যে ইচ্ছামতীর নতুন সংখ্যা আসার সময় হয়ে গেছে? সেই কত্তদিন আগে শীত সংখ্যা নিয়ে এসেছিল, তারপর শীত গিয়ে বসন্তকাল কখন ফুরুত করে চলে গেল, আর প্রচন্ড রেগেমেগে এসে গেল প্রখর গ্রীষ্মকাল। সূর্য্যিঠাকুর দক্ষিণ দেশ থেকে বেড়িয়ে ফিরে চলে এলেন, উত্তরের আঙ্গিনায় দিন বড় আর রাত ছোট হয়ে গেল, অথচ ইচ্ছামতীর প্রথম পাতায় এখনও শীতের বরফঢাকা ঠাণ্ডা পাহাড়ের ছবি! আর এদিকে গরমে সবার হাঁসফাঁস অবস্থা - ভোর না হতেই চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয়, বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে গরম, কোথাও বা দরদরে ঘামে ভিজে যাচ্ছে শরীর, কোথাও বা বইছে গরম 'লু'...শুকিয়ে যাচ্ছে বারান্দার কোনে লতিয়ে ওঠা নরম অপরাজিতার চারাটা, ঝলসে যাচ্ছে ক্রোটোনের রংবেরঙের পাতাগুলি...

সারাদিন চোখ রাঙ্গিয়ে পৃথিবীকে বকুনি-টকুনি দিয়ে সন্ধ্যের দিকে সূয্যিঠাকুর পাটে গেলে তবেই যেন একটু শান্তি নেমে আসে...তখন দক্ষিণের থেকে সমুদ্দুর পাঠিয়ে দেয় ঠাণ্ডা ঠান্ডা দখিনা হাওয়া, জুড়িয়ে দেয় পৃথিবীর বুক। সারাদিনের ক্লান্তিতে শ্রান্ত পৃথিবী তখন গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ে তারাভরা ঘন নীল

আকাশের দিকে তাকিয়ে। আকাশকে ডেকে বলে - ও আকাশ, মেঘের দেশে খবর পাঠাও...সুয্যিঠাকুরের রাগ কমাতে হবে তো...তাই শুনে আকাশ তড়িঘড়ি খবর পাঠায় মেঘের দেশে...তার খবর পেয়ে মেঘ রাজা এক বিকেলে পাঠিয়ে দেয় ধূসরকৃষ্ণ মেঘসৈন্যদের...তারা দুন্দুভি-দামামা বাজিয়ে ছেয়ে ফেলে আকাশ, ঝলসিয়ে দেয় বিদ্যুতের চকচকে ফলা, ঢেকে দেয় সূর্য্যকে, শুকনো তৃষিত পৃথিবীর বুকে ঢেলে দেয় ঠাণ্ডা জল, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে ঝড়ের রানী কালবৈশাখি...

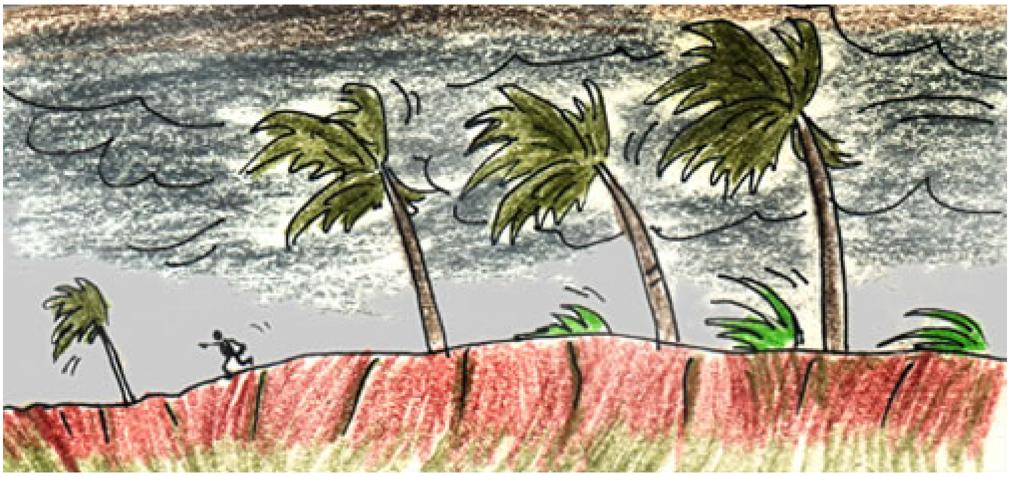

দেখ একবার... আমাদের কেন দেরি হল, সেই গল্প করতে গিয়ে করে ফেললাম গ্রীষ্মের সাতকাহন! আসলে সুয্যিঠাকুরের রাগের প্রকোপে আমাদেরও একটু হাঁসফাস অবস্থা। আর তাই, ইচ্ছামতীকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোমার কাছে নিয়ে আসতে গিয়ে আমি একেবারে ঘেমে-নেয়ে একসা হয়ে গেছি...যাকগে, আর কথা না বাড়িয়ে, আমি বরং তোমাকে জানিয়ে দিই, এই সংখ্যায় তোমার জন্য কি কি থাকছে। এই সংখ্যায় থাকছে চারটে নানা স্বাদের গল্প, অনেকগুলি ছড়া; থাকছে আইভরি কোস্টের বাসিন্দা আলির গল্প; শীত -গ্রীষ্মের নানান তথ্য; গ্রীষ্মের চিঠি; আর থাকছে নববর্ষে তোমার জন্য কিছু মজাদার উপহার।

আচ্ছা বলতো, বৈশাখ মাসটা কি আমাদের কাছে শুধুমাত্র নববর্ষের জন্যই পরিচিত? নাকি বাংলা বছরের প্রথম মাস বলে? না, শুধুমাত্র এই দুটো কারণের জন্য বৈশাখ আমাদের কাছে এত পরিচিত মাস নয়। এই মাস আমাদের কাছে অনেক বেশি পরিচিত একটা বিশেষ দিনের, বিশেষ তারিখে জন্য। এতক্ষণে তুমি নিশ্চয় বুঝে গেছ কোন দিনের কথা বলছি। হ্যাঁ, পঁচিশে বৈশাখ হল সেই বিশেষ দিন। সেইদিন আপামর বাঙালির মনের মানুষ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। ইংরাজি ১৮৬১ সালে ৭ই মে ছিল বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। এই ২০১১ সালে আমরা তাঁর জন্মদিনের ১৫০ বছর পালন করছি।ভাবো তো, একজন মানুষ, কত বিশাল মাপের হলে, কত ভালবাসার জন হলে, তাঁর জন্মদিন একশো বছরেরও বেশি সময়ে ধরে, সারা দেশ জুড়ে পালন করা হয়...। শুধু তাই নয়, তাঁর লেখা বই 'সহজ পাঠ' স্কুলে ছোটদের বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য পড়ানো হয়; তাঁর লেখা অগুন্তি গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ সব বয়সের মানুষকে নতুন ভাবনা-চিন্তার খোরাক যোগায়; শুধু কি এই? তাঁর লেখা গান, আমাদের জীবনের প্রতি মূহূর্তের সাথী; সকালের প্রার্থনা হোক, বা উতসবের সন্ধ্যা, রবি ঠাকুরের গান ছাড়া যে সবই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই সংখ্যার 'গ্রীষ্মের চিঠি'তে থাকছে এই রবি ঠাকুরের ছোটবেলার, তাঁর ভাবনা-চিন্তার, তাঁর হাতে তৈরি শান্তিনিকেতনের গল্প আর ছবি।

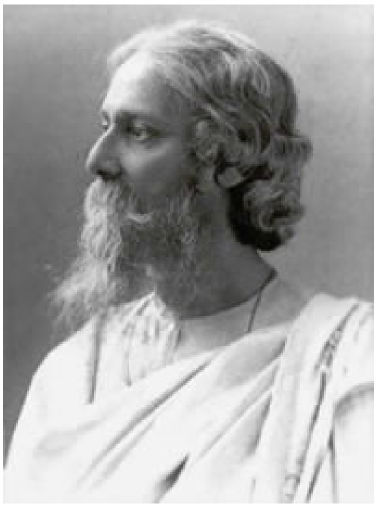

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই মে মাসে ২ তারিখে আমাদের আরেক মনের মানুষ সত্যজিত রায়ের জন্মদিন। তাই এই সংখ্যার 'ছবির খবর' বিভাগে থাকছে অপুর গল্প। পড়ে দেখ কিন্তু।

সত্যজিত রায়

থাকছে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রেবন্ত গোস্বামীর আঁকা আর লেখা; আর থাকছে জনপ্রিয় শিশু-সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তীর লেখা বিদেশি রূপকথা।

চিঠির শুরুতে তোমাকে বলছিলাম মেঘ, বৃষ্টি, কালবৈশাখির গল্প, সূর্য্যিঠাকুরের রেগে যাওয়ার গল্প... এদিকে কিছুদিন আগে পৃথিবী নিজেই যে একটু একটু রাগ দেখাতে শুরু করেছে, সে খবরটা তো তুমি শুনেছ নিশ্চয়...এইয়াফ্যাতলাওকুল (Eyjafjallajokull) নামের আইসল্যান্ডের সেই আগ্নেয়গিরি, যার ভেতর থেকে মাত্র কয়েকদিন আগে এত লাভা এবং ছাই বেরিয়েছে, যে, সেই ধূসর ছাই কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠে গিয়ে ঢেকে ফেলেছিল ইউরোপের অনেকখানি আকাশ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিমানের উড়ান বন্ধ হয়ে গেছিল। এখনও বহু যাত্রী তাদের ঘরে ফিরতে পারেননি, আইসল্যান্ডের বহু খামারের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, এবং এই পরিস্থিতি আরো বেশ কিছুদিন চলতে পারে। এই ছাই

ভরতি মেঘের কারনে পরিবেশের ভারসাম্য ও নষ্ট হতে পারে।

এইয়াফ্যাতলাওকুল

এইরকম একটা ঘটনা যখন ঘটে, তখন যেন আমরা নতুন করে, আবার করে বুঝতে পারি, প্রকৃতি মা কতটা শক্তিশালী; তার আঙ্গুলের এক টোকায় ভেঙ্গে পড়তে পারে বিশাল হিমবাহ; তার হালকা ফুঁয়ে উঠতে পারে প্রবল জলোচ্ছ্বাস; সে নড়ে উঠলে জেগে উঠতে পারে আগ্নেয়গিরি। কিন্তু তাই বলে প্রকৃতিকে ভয় পেলে চলবে না। বরং প্রকৃতিকে ভালবাসতে হবে। আগামি ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। তুমি কি ভেবে দেখেছ, কিভাবে তুমি তোমার পরিবেশকে সুন্দর রাখতে পারো, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারো?

আমি বরং আমার কথা এবার শেষ করি। আর তুমিও বসে পড় ইচ্ছামতীর সাথে, জমিয়ে আনন্দ ভাগ করে নিতে।

ভাল থেকো।
চাঁদের বুড়ি

২১ বৈশাখ ১৪১৭
৫ই মে,২০১০

ছবিঃ উইকিপিডিয়া

নববর্ষের উপহার

এই নববর্ষে, ইচ্ছামতী তোমার জন্য এনেছে নতুন উপহার - প্রখ্যাত শিল্পী রেবন্ত গোস্বামী তোমার জন্য এঁকে দিয়েছেন একটা মজার মোরগ এর ছবি। এই মোরগের ছবিটিকে ডাউনলোড করে প্রিন্টআউট নাও, আর ভরিয়ে ফেলো তোমার পছন্দমত রঙে।

এই মোরগের ছবি ডাউনলোড করে নাও এইখানে।

আরো মজার জিনিষ আছে। তোমাদের জন্য রইল কতগুলি মজাদার ছবি। ভালো করে দেখ, এই ছবিগুলির মধ্যে, কেমন করে চেনাজানা কতগুলো শব্দ, অন্যরকম মানে নিয়ে ফেলে।
একটু ভাবো, আর আমাকে লিখে পাঠাও এরকম আরো নানা শব্দ যেগুলি দিয়ে মজার ছবি আঁকা যায়। অথবা তুমি নিজেও এঁকে ফেলতে পারো এইরকম মজাদার ছবি, আর পাঠিয়ে দিও আমাকে।

চাষ-বাস

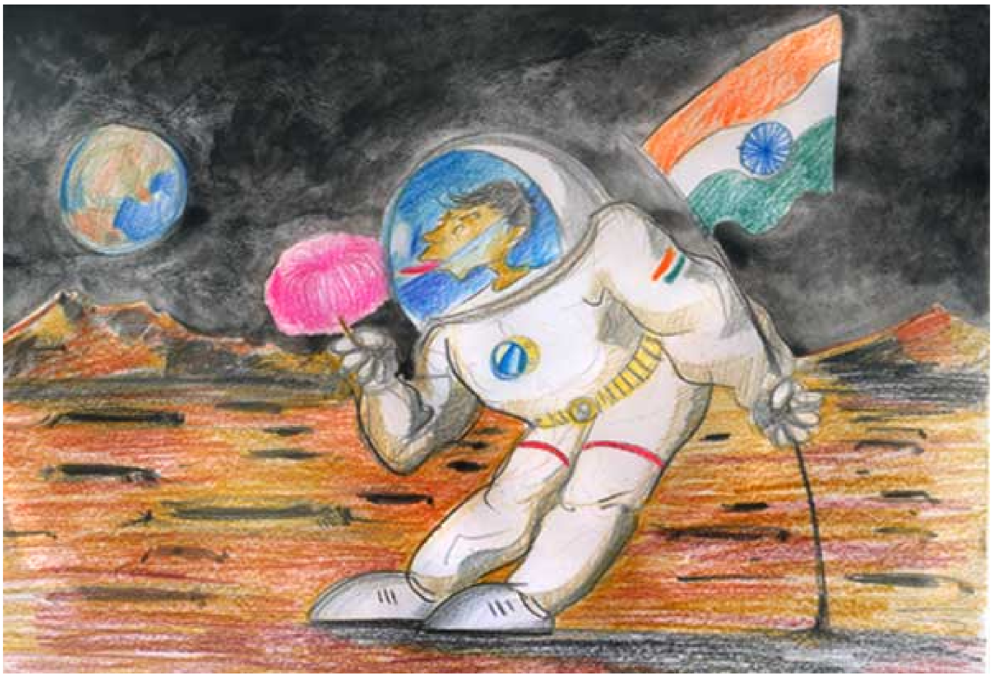

চাঁদের-বুড়ির-চুল

মাছ-রাঙা

গ্রীষ্মের চিঠি: ছোট্ট রবির সাথে

সেদিন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে সাজ সাজ রব। কারো এতটুকু নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। কাজের লোক থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন সবাই তটস্থ...নিয়মের এতটুকু যেন এদিক থেকে ওদিক না হয়। সময়ের কাজ যেন সময়ে হয়...ফাঁকি দেওয়া...পড়ে থাকা কাজ মোটেই পছন্দ নয় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের। তাই সবকিছু হচ্ছে পরিপাটি নিয়ম অনুযায়ী। আর হবেই বা না কেনো? আজ তো ছোট্ট রবি এই প্রথম বাবার সাথে বাইরে বেরোবে। যাবে অনেক দূর...সেই হিমালয়। সকাল থেকে তাই রবির খুশি আর ধরে না। কোথায় বেঙ্গল একাডেমিতে একঘেয়ে ক্লাস আর কোথায় পাহাড় ঘেরা...সেই অনেক পুরোনো গাছের ছায়ায় রূপকথার পথ। যা এতদিন রবি শুধু গল্পই শুনে এসেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি যেমন বাবার সাথে খুব লাফাই-ঝাঁপাই করো...কথায় কথায় বাবার ওপর রেগে যাও...বায়না করো...ছোট্ট রবির কিন্তু সেসব করার কোনো সুযোগই ছিলো না। বাবাকে সেতো কাছেই পায়নি কোনোদিন। বাবা থাকতেন বেশিরভাগ সময়টাই বাড়ির বাইরে, অনেক দূরে, পাহাড়ের কোলে। বাড়ি যখন ফিরতেন তখন ছোট্ট রবি কখোনো আড়াল থেকে আবার কখোনো বা লুকিয়ে বাবাকে দেখতো। তেতালার বারান্দাতে যেখানটায় অনায়াসে ছোটাছুটি করে খেলা যায়...সেখানেও খেলা বারণ হয়ে যেত রবিদের।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

ছোট্ট ছেলে লক্ষ্য করতো বাবা বাড়ি এলে সবাই কেমন যেন নিয়মের আড়ালে চলে যায়। গমগম করে উঠতে থাকে বাড়িটা। এতোদিন যে ছন্নছাড়া...গা ভাসানো ব্যাপার চলতো তা যেন নিমেষে বন্ধ হতো। মা নিজে গিয়ে রান্নার তদারকি করতেন। গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরে, সংযত পরিচ্ছন্ন হয়ে, মুখে পান থাকলে তা ফেলে দিয়ে বাবার সাথে দেখা করতে যেতেন। বুড়ো কিনু হরকরা তার তকমাওয়ালা পাগড়ি আর শুভ্র চাপকান পড়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো। কখন কি দরকার হয় মহর্ষির...সেই দিকে তার খেয়াল।

সে যাই হোক আজ তো রবির আর একটুও দেরী করতে ইচ্ছে করছে না। কখন সে বাইরে বেরোবে? কখন সে ট্রেনে উঠবে? ট্রেনে উঠলে নাকি মানুষ ছিটকে যায়? এইসব ভাবনা তার মাথায় ভিড় করে আসে। কিন্তু তার এই উতকন্ঠা...আনন্দ সে যেন নিজের মনের মধ্যেই চুপ করে রেখে দেয়। খুব একটা কিছু বলতে পারে না। শুধু সেই দিনটার কথা মনে পড়ে যায়। সবে পৈতে হয়েছে, ন্যাড়া মাথা নিয়ে কিভাবে স্কুলে যাবে? কয়েকজনকে রবি এই প্রশ্নটা করেছে কিন্তু তেমন কোনো উত্তর পায়নি। কেউ চোখ বড় বড় করে শাসন করেছে আবার কেউ বা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে সব কিছু। আর পৈতের আগেও তো কম ঝামেলা সহ্য করতে হয়নি, বৈদিক মন্ত্র রীতিমতো মুখস্থ করতে হয়েছে রবিদের। বেচারামবাবু রোজ এসে সেগুলো মুখস্থ করিয়েছেন। তাও নয় সহ্য করা গেছে কিন্তু এখন এই ন্যাড়া মাথা নিয়ে কি করে ফিরিঙ্গি বন্ধুদের মাঝে গিয়ে বসবে তাই ভেবে উঠতে পারে না রবি।

এমন সময় একদিন তেতালায় বাবার ঘর থেকে ডাক আসে। খুব ধীর পায়ে রবি গিয়ে দাঁড়ায় শ্বেতশুভ্র পোষাকে আবৃত প্রায় ধ্যানস্থ পিতার সামনে। মহর্ষি জিজ্ঞাসা করলেন রবি হিমালয়ে যেতে চায় কিনা।

হ্যাঁ...এই কথাটা যদি সে চিতকার করে বলতে পারতো তাহলে হয়তো সেদিন সে আরো বেশি খুশি হতো। রবির জন্য এই প্রথম পোষাক বানানো হলো। যেমন তেমন নয় মখমলের কাজ করা জরির গোল টুপি, তার সাথে মানানসই জোব্বা আরো কতকিছু।

বেরোনোর আগে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বাবা বাড়ির সকলকে নিয়ে দালানে উপাসনায় বসলেন।

উপাসনা শেষে বাড়ির গুরুজনদের প্রণাম করে রবি বাবার সাথে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বসলো। মাঝে মাঝে টুপি খোলার চেষ্টা করেছিলো...কিন্তু বাবার আপত্তিতে তাকে সেটা মাথায় পরে বসে থাকতে হলো। ট্রেনে উঠে রবি একটুও ভয় পেলো না। ছিটকেও পড়লো না। তার হাসি পেলো, ট্রেনে চড়ার সেই আজগুবি গল্পের কথা মনে করে।

দুপাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে গাছ-গাছালি...ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর গ্রাম...। রবি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। এর আগে তো মাকে ছেড়ে, বাড়ির দাদাদের ছেড়ে, অনেক দূরে রবি কোথাও যায়নি...কিন্তু একটুও মন কেমন করে না। বরং ভালো লাগে। সন্ধ্যার সময় তারা বোলপুরে নামে।

এর আগে এই বোলপুরের কথা রবি অনেকের কাছে শুনেছে। তার দাদারা, বৌদিরা এমনকি তার খুব কাছের বন্ধু সত্যও ঘুরে গেছে। পালকিতে উঠেই রবি চোখ বন্ধ করে। মনে মনে ভাবে সক্কালবেলা সে চোখ খুলবে...তাহলেই হয়তো সে দেখতে পাবে সেই পথটা যেখানে রোদ বৃষ্টি কিচ্ছুটি গায়ে লাগে না। অন্তত সত্যর লাগে নি। রবি যতক্ষণ চোখ বুঁজে আছে আর পালকিতে করে চলেছে ততক্ষণে চলো আমরা দেখি এই বোলপুরে হঠাত মহর্ষি তার ছেলেকে নিয়ে এলেন কেন।

আসলে এটা তাঁর খুব প্রিয় জায়গা ছিলো। ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১৮ ফাল্গুন প্রায় কুড়ি বিঘা জায়গা তিনি কিনে নেন। কিন্তু কেন কিনলেন? শোনা যায় এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এখানকার একটা ছাতিম গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। হঠাতই তাঁর মনে এক অনাবিল পবিত্র আনন্দের সঞ্চার হয়। পরম ঈশ্বরে বিশ্বাসী দেবেন্দ্র নাথ এখানে একটি বাড়ি তৈরী করে নাম দেন শান্তিনিকেতন। পরে একটা উপাসনা গৃহ নির্মাণ করেন যেখানে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোক এসে নির্জনে উপাসনা করতে

পারবেন। মাঝে মাঝেই এখানে আসতেন মহর্ষি। ছোট্ট রবিকেও তিনি নিয়ে এলেন এখানে।

কিন্তু সত্যর গল্পের সাথে কোথাও যেন মিলছে না বোলপুর। কোথায় রাখাল? কোথায় সেই বিস্তৃত ধান ক্ষেত। যেখানে বসে সত্য ধান ক্ষেত থেকে ধান তুলে ভাত রান্না করে রাখালদের সাথে খেতো? রবি বুঝতে পারলো সে গুলো গল্প কথা। আসলে বোলপুর শুকনো জায়গা...সেই লাল পাথুরে মাটিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালো লেগে যায় ছোট্ট রবির।

সে চারিদিক ঘুরে বেড়ায়...আর কোথায় যেন প্রকৃতির সাথে...বাবার সাথে একটু একটু করে পরিচিত হতে থাকে সে। বাবা এইসময় ছোট্ট রবিকে অনেক অনেক দায়িত্ব দেন। তাঁর সোনার ঘড়িতে দম দেওয়া, নিয়মিত পড়াশুনো করা, ঘুরে বেড়ানো...সবকিছু... সেটা যেন রবির নিজেরই দায়িত্ব।

ভালো লেগে যায় রবির বোলপুর। শান্তিনিকেতন।

কোথাও যেন বাঁধাধরা নিয়মের গন্ডি নেই। বাবার সাথে প্রকৃতির পাঠ নিতে নিতেই কি রবির মনে হয়েছিলো যে স্কুলের পড়া থেকে এই পড়া অনেক অনেক ভালো। যেখানে গাছ তার নিবিড় ছায়া দিলো, পাখি দিলো সঙ্গ... প্রকৃতি মেলে দিলো তার সবুজ আঁচল। ছোট্ট রবি যেন বিশ্ব দীক্ষায় দিক্ষীত হলো। নতুন করে চিনতে শিখলো সে সব কিছু।

এরপর সে যখন অনেক বড় হলো। লোকে যখন তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে চিনতে শুরু করলো...তার গান শুনে, লেখা পড়ে লোকে যখন তাকে ভালো বাসলো তখন তিনি শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। সেই বিদ্যালয় একটা সময় তার ডালপালা মেলে অনেক বড় হলো। ১৯২১ সালের ২২ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো বিশ্বভারতীর।

রবির ইচ্ছায় প্রকৃতির পাঠশালায় সবাই শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলো। শুধু পাঠ্য বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা নয় এখানকার ছেলেমেয়েরা শিখলো গান গাইতে, ছবি আঁকতে, নাচতে, হাতের কাজ করতে।

একদিন কলকাতায় নিজের বাড়ির গন্ডি টপকিয়ে যে ছোট্ট ছেলেটি বাবার হাত ধরে বোলপুরে এসেছিলো...সেই একদিন গোটা বিশ্বের কাছে তাকে পরিচিত করালো। ভারতের এক অন্যতম সাংস্কৃতিক পিঠস্থান হয়ে উঠলো বিশ্বভারতী।

যদি কখোনো তুমি শান্তিনিকেতনে যাও...গাছের সারির মধ্যে দিয়ে হাঁটো...দেখবে নানান ফুল তোমাকে ঘিরে ধরছে...অনেক পুরোনো পুরোনো গাছ তোমাকে সেই লাল মাটির রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে...যে পথ দিয়ে একদিন ছোট্ট রবি তার বাবার সাথে হেঁটেছিলো।

লেখা ও ছবি
কল্লোল লাহিড়ী

অন্যান্য ছবিঃ
ইন্টারনেট

উজ্জ্বল অধ্যায়ঃ পর্ব ৩

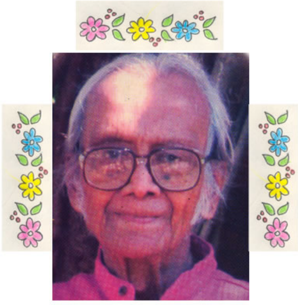

রেবতীভূষণ ঘোষ

বাংলা ১৪০৫ সালে, সুদূর সুইডেনে বসে, রেবতীভূষণ এই ছড়াটি লিখে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর কচি-কাঁচা পাঠকদের জন্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ টগবগ

ছড়া-কবিতা

ইচ্ছামতী

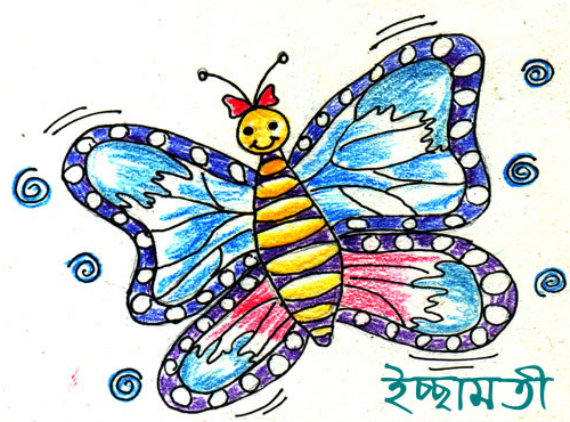

ইচ্ছামতি ইচ্ছামতি
এক যে আছে ছোট্টো নদী
খুশির স্রোতে অবাধ গতি
যেমন ইচ্ছে যেমন মতি

অথবা সে ছোট্টো মেয়ে
উঠলো বেড়ে আদর পেয়ে
দুষ্টু চোখে মিষ্টি হেসে
মনের ভুবন ফেললো ছেয়ে

ইচ্ছামতি ইচ্ছামতি
হয়তো সে এক প্রজাপতি
মেললো দুটি রঙিন ডানা
অচিনপুরে তার ঠিকানা

ইচ্ছামতির রঙিন ঝুরি
গল্প ছড়া ভুরি ভুরি
পড়বে তোমরা স্বপ্ন চোখে
এখন যারা ছোট্টো কুঁড়ি।

দ্বৈতা গোস্বামী
গুরগাঁও, হরিয়ানা

দুই শেয়ালের গল্প

রাতদুপুরে একটা শেয়াল
ডাকলো হেঁকে হুক্কা হুয়া -
পাশের শেয়াল ঘুমিয়ে ছিল
বললো উঠে, কেয়া হুয়া?
পয়লা শেয়াল বললো তখন,
দেখে এলাম পালবাবুদের
মুর্গিরাখার খুপিখানি
হাট করে দোর খোলা ফের।
লাফিয়ে বলে পাশের শেয়াল,
আভি হামি যাতা হ্যায়।
পয়লা শেয়াল বললো তাকে,
লেকিন বঁহা কুত্তা হ্যায়।
চলনা ইয়ার, ঘুরেই আসি--
বললো আবার পাশের শেয়াল ;
পায়ে পায়ে গিয়ে দেখে
কুকুর যেন মস্ত দেয়াল।
দ্বিতীয় শেয়াল হামা দিয়ে
একটু গেল যেই এগিয়ে
কুত্তাখানা ছুট্টে এসে
ধরলো পায়ে কামড় দিয়ে।
তাইনা দেখে পয়লা শেয়াল
লাফটি দিয়ে ছুটলো বেগে ;
অতি লোভে তাঁতি মরে--
পিছু ফিরে বললো রেগে।

জামাল ভড়
বারাসাত
উত্তর চব্বিশ পরগনা

প্যালার বুদ্ধি

আমার বন্ধু প্যালা
সে মস্ত বড় বীর,
সেবার স্কুলের ছুটি,
গেছে কাশ্মীর।
ট্রেনের ভেতর ছিল
কটা দুষ্টু লোক,
প্যালাকে ওরা খেতে দিল
ঠান্ডা ঠান্ডা কোক্।
প্যালা কিন্তু ভয় পেল না
হাতে নিল বরফ,
বরফ দিয়ে doll বানিয়ে
এঁকে দিল গোঁফ।
প্যালার কান্ড দেখে ওরা
হেসে কেঁদে মরে,
সেই ফাঁকেতে প্যালা তখন
ফেরার ট্রেন ধরে।

পৃথ্বীরাজ চৌধুরি
বস্টন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

হরেক ডাক

কুকুর ডাকে ভীষণ জোরে
ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ।
বিড়াল ডাকে করুণ সুরে
মিউ মিউ মিউ মিউ।।
'বউ কথা কও' পাখীটা বলে
বউ কথা কও, বউ।
পাপিয়াটার স্বরটা মধুর
পিউ কাঁহা পিউ, পিউ।।
সাঁঝের বেলা আসে ভেসে
ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁ।
ঘোড়াগুলো সব হ্রেষা রবে
আওয়াজ তোলে চিঁহি।।
শকুনিটা ওই কাঁদে এমন
ঠিক যেন এক শিশু।
অমন আওয়াজ প্রায়ই তোলে
আমাদের ওই বিশু।।
বাছুর ছোটে মায়ের পিছে
বলে – হাম্বা হাম্বা।
আমরা যখন ডাকি মাকে
বলি – মা, ওম্মা।।

রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য
কলকাতা

এলোপাথাড়ি- বনবাদাড়ি ছড়া

মৌচাকে মৌমাছি থাকে কোটি গণ্ডা
ছোট ছোট পাখা নিয়ে ছোট ছোট গুণ্ডা।
ইয়া বড়া ছাতিওলা এক খানা ষণ্ডা
সকলের পিছে থাকে তাইতো সে পাণ্ডা।

পাণ্ডার কালো চোখ সাদা ভ্রুতে ঢাকা।
ভ্রু তো নয়, চোখ ঘিরে থাকা এক চাকা।
বাঁশপাতা, কচি বাঁশ খেতে এরা পাকা।
মুস্কিলে টিকে আছে, বাঁশবন ফাঁকা।

বাঁশবন কাশবন সবই বটে ঘাসবন
কলাপাতা তালপাতা আলধারে কচুবন
ওলকচু, মানকচু কুটকুটে কী ভীষণ
আমাদার টক দিলে পুরো হবে
আয়োজন।

আমাদাতে আছে দুই আম আর আদা
খেতে যেন কাঁচা আম, চেহারাতে আদা
বর্ষায় বাগানে হয়ে যেত গাদা
তার পাশে ফুটত দোপাটি বা গাঁদা।

গাঁদা ফুল ফুল নয় ফুলেদের মাথা;
এ তো সেই কবেকার পচে যাওয়া কথা;
এই নিয়ে বায়োলজি রামায়ণ যথা;
টাকটুকু থাকবে না খসে গেলে মাথা।

টাকের নীচে রেখে বালিশ
টাকের উপর মেখে মালিশ
টাকে হল দারুন পালিশ
টাকের নেইকো কোন নালিশ।

নালিশ যদি রোজ সকালে ছুটে যায়
দরবার,
কাজী সাহেব মুচকি হেসে বুঝে নেন,
দরকার।
হুকুম হেঁকে তারিখ লাগান পাশে বসা
পেশকার;
ক্যালেন্ডারে খুঁজতে থাকেন আসছে কবে

রবিবার।

শনিবারে সিনাগগ, রবিবারে চার্চ।
মসজিদে, মন্দিরে এপ্রিল মার্চ।
পাতা ছাড়ে গরমেই ওক আর বার্চ।
চব্বিশ ঘন্টাই গুগুলের সার্চ।

ঘন্টা নেড়ে ডাক দিয়ে ছুটি;
ব্যাগে পিঠে তখন কাটাকুটি;
মনের মধ্যে খুশির লুটোপুটি;
গেমের মধ্যে মাপা পায়ে ছুটি।

আয় টিপ টিপ পা টিপ টিপ
রং টিপটিপ ফুল ছাপ
আয় ঝুপঝুপ ঝড় ঝমাঝম
ঘুমে চুপচাপ বাদলা রাত।

সংহিতা মুখোপাধ্যায়
পেনসিলভানিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

গল্প-স্বল্প

ম্যাজিক

১

রবিবারের সকাল। আজ ইস্কুল নেই। পড়া নেই। তবু রবিবারের সকালটাই তাতানের সবচেয়ে অপছন্দ। ঠিক নটা থেকে তার আঁকার ক্লাস। আঁকার মাস্টারমশাই জগদীশ খুব গম্ভীর আর রাগী মানুষ। একটুও হাসেন না। সবাইকে আঁকার ক্লাসে গিয়ে রোজ একটা কিছু দেওয়া হয়। আঁকতে তাতানের একটুও যে ইচ্ছে করে না এমন নয়। কিন্তু আজ অবধি তার একটা ছবিও ভাল হয়নি। একটা লাইনও সে সোজা করে টানতে পারেনি। একটা গোল জিনিসও গোল হয়নি, তা সেটা পেঁপেই হোক আর কুমড়োই হোক। রোজ সে কোন একটা গোলমাল করেই, আর শেষমেষ মাস্টারমশাই একটু ঠিকঠাক করে দেন। ওখানে সবাই ওর চেয়ে ভাল আঁকে। বড়রা তো বটেই, এমনকি ওর সমবয়সী বা ছোটরাও। তাই এই ইস্কুলে যেতে তার একেবারেই ভাল লাগে না। তবু যেতেই হবে। রবিবারে শরীরও খারাপ হয় না একদিন।

সকালে আটটার সময় তাতান শুনতে পেল যে মা তাকে ডাকছে। তখনও সে ইচ্ছে করেই সাড়া দিল না। শুয়ে শুয়েই কালো রঙের বড় দেওয়াল ঘড়িটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আঁকার ক্লাস তো বলতে গেলে পাশের বাড়িতেই। ওদের পাড়াতেই গুবলুদের বাড়িতে মাস্টারমশাই আসেন। একদল ছেলেমেয়ে চারদিকে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে। মাস্টারমশাই দুকাপ চা খান। বড়রা কেউ না কেউ এসে গল্প করে। তারপর সবার আঁকার খাতা দেখে নেন এক এক করে। দু আড়াই ঘন্টা এইভাবেই কেটে যায়। বিছানার পাশের জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল তাতান। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। পিঠে রোদ্দুর। ঝকঝক করছে একটা সকাল। তাতান বিছানার ওপরে সোজা উঠেও লেপটা জড়িয়ে বসে রইল। রোজ সকালে পাঁচটার সময় উঠতে হয় ইস্কুলে যাওয়ার জন্য। এমনকি শনিবারেও। পিন্টুদের তো কি সুন্দর শনিবারে হাফছুটি হয়। ওদের হয়না। সপ্তাহে রোজ ইস্কুল করে রবিবারে যে একটু ছুটি পাবে তা হওয়ার জো নেই।

বাবার গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'তাতান উঠে পড়ো এবার। মা আর কতক্ষন ধরে ডাকবে তোমায়।'

এবার না উঠে উপায় নেই। তাও সে একটু করুন সুরে আবদার করল, 'বাবা, আজকে আঁকার ইস্কুলে

না গেলে হবে? একদম ইচ্ছে করছে না।'

'কেন? সে তো তোমার প্রত্যেক সপ্তাহেই ইচ্ছে করে না।'

'মাস্টারমশাইকে খুব রাগী মনে হয় যে'

'তোমার মাস্টারমশাইকে আমি চিনি। খুব ভাল লোক আর মোটেও রাগী নয়।'

আসল কারনটা যে বাবাকে বলা যাবে না। তার ওপর সকাল সাড়ে নটা থেকে টিভিতে মিকি মাউস আছে। কালেভদ্রে একবার ঐ কার্টুনটা দেখা হয়। মামার বাড়ী গেলে বা আঁকার ইস্কুল ছুটি থাকলে। প্রত্যেক রবিবার সকালে আঁকার ক্লাসে বসে ঐ কথাটাই বারবার মনে পড়ে তাতানের। আজও সেই দুঃখের কথা ভেবেই পা দিল মাটিতে। লাল রঙের মেঝেটাও বেশ কনকনে ঠান্ডা। সেই ঠান্ডা তাতানের হাফপ্যান্টের বাইরের পা দুটোকে কাঁপিয়ে দিল।

২

কদিন আগে বায়না করে একটা টিয়াপাখি কিনেছে তাতান। সেটা রাখা থাকে বারান্দায়। বাড়ির বাইরের বারান্দা নয়, ভেতরেই। তাতান পায়ে পায়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কিরে কিছু শিখেছিস?'

পাখিটা বড় দুষ্টু। সবাই বলত টিয়াপাখি নাকি মানুষের মত কথা বলতে পারে। কিন্তু কোথায় কি? সে কত চেষ্টাই না করেছে। কিন্তু টিয়ার মুখে কোন কথা নেই। সপ্তাহ দুয়েক পরে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল সে। আজকাল রোজ সকালে উঠে সে শুধু জিজ্ঞেস করে, 'কিরে টিয়া কিছু শিখেছিস?' টিয়া কিছুই বলে না। অথচ আজ ওকে অবাক করে দিয়ে টিয়া বলে উঠল, 'হয় হয়, হবে হবে হবে।' মানুষের মত সে আওয়াজ নয়, বরং একটু খনখনে। তবে পরিষ্কার শুনতে পেল তাতান। কোন ভুল নেই তাতে।

'হয় হয় আবার কি রে? হবে মানে কি হবে?' জিজ্ঞেস করার পরেই তাতানের মনে হল এটা একটু বোকা বোকা হয়ে যাচ্ছে। পাখি তো শুনে শুনে শেখে। সে কি আর মানুষের মত কথা বুঝতে পারে? এর পরেও তাকে অবাক করে দিয়ে টিয়া বলল, 'তোমার হবে'। তাতান হাতে ব্রাশটা নিয়ে একটু সন্দেহের সঙ্গে পাখির দিকে তাকাল।

পাখিটাও মিটিমিটি ওকে দেখছে। তীক্ষ্ণ সে চাহনি। তাতান ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি হবে?' পাখিটা এবার আর জবাব দিল না। নাহ, কিছু একটা ভুল হয়ে থাকবে। আর বোঝার চেষ্টা না করে কোনরকমে চোখে মুখ একটু জল দিয়ে ধুয়ে সে রান্নাঘরে ছুট দিল মার কাছে। লুচিভাজা হচ্ছে আজ। গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

'কি রে কি করে মুখ ধুয়েছিস তুই? তোর চোখের কোনে যে পিচুটি লেগে রয়েছে এখনো। রোজ এতবার করে বলি, তাও শুনিস না?'

'মা, জানো পাখিটা না আজকে কথা বলছিল মনে হল...'

'কোথায় আমরা তো কিছু বলতে শুনি না। তুই খামখা বায়না করে পাখিটা কিনলি।' বলতে বলতে তিনি তাতানের চোখের কোনদুটো পরিষ্কার করে দিলেন। 'নে খেয়ে নে, আর দেরী করিস নি। আঁকার ইস্কুলে চলে যা। আজকে থেকে তো আবার তোদের নতুন মাস্টারমশাই আসবেন।'

তাতানের আরেকটু তর্ক করার ইচ্ছে ছিল যে পাখিটা সত্যিই কথা বলেছে কিন্তু মাস্টারমশাই বদলে গেছেন এই খবরটা তো একেবারেই নতুন। সে রীতিমত চমকে গিয়ে বলল, 'তুমি কি করে জানলে?'

৩

গুবলুদের বাড়ি পৌঁছে একটু অবাকই হল তাতান। আজ প্রায় অনেকেই আসেনি। আর অনেকটা তার দাদার মত একটা অল্পবয়সী ছেলেকে ঘিয়ে সবাই বসে আছে আর হেসে হেসে গল্প করছে। তাতান ওর মত একটা জায়গায় একটু আলাদা হয়ে বসে কাঁধে ঝোলান ব্যাগ থেকে বোর্ড, রঙ, তুলি, প্যালেট এইসব বের করে রাখল। কে জানে আজকের নতুন মাস্টারমশাই কখন আসবে। আবার কি আঁকতে দেবে। প্রথম দিনেই প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে না তো?

'তুমি এরকম দূরে দূরে বসে আছো কেন?' ছেলেটা ওকে ডাকল। তাতান কিছু বলল না। চুপ করে বসে রইল। সবার সামনে বলবেই বা কি করে যে ও ভাল আঁকতে পারে না। কিন্তু ছেলেটাও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে বলল, 'আরে, এসই না এখানে। আমরা কি সুন্দর গল্প করছি।'

'মাস্টারমশাই কখন আসবেন?' একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল তাতান। জগদীশ স্যার তো কোনদিন হেসে কথাই বলতেন না। কেউ হাসাহাসি করলেও রাগ করতেন। আর এ কে যে সব্বার সঙ্গে বসে গল্প করছে?

'মাস্টারমশাই? ও না, মাস্টারমশাই তো আসবেন না আজকে।'

'তাহলে আঁকা শেখাবে কে?'

'ও তুমি এমনিই শিখে যাবে। কোথাও ভুলটুল হলে আমি না হয় দেখিয়ে দেব এখন।'

তাতান আরো অবাক, 'ও তুমিই বুঝি আমাদের নতুন মাস্টারমশাই?' মা বার বার বলে দিয়েছে মাস্টারমশাইকে তুমি করে না বলতে, কিন্তু ছেলেটাকে কিছুতেই আপনি পারছে না সে।

'না না, আমাকে কিন্তু তোমাদের মাস্টারমশাই বলার দরকার নেই। আমাকে ভুলুদা বলেই ডেকো। এখন থেকে আমরা এখানে রবিবার রবিবার করে সবাই মিলে আঁকব, তোমরাও আঁকবে, আমিও আঁকব। তা তোমার নাম কি?'

'আমার ভাল নাম অর্কপ্রভ, আর ডাকনাম তাতান।'

'বাহ, বেশ সুন্দর নাম। ঠিক আছে। দেখি আজকে কি আঁকা যায়।' এই বলে সে তার ঝোলা থেকে একটা মোটা খাতা বের করে আনল। সঙ্গে কিছু পেনসিল, আর কয়লার টুকরোর মত কিছু। কিন্তু কোন রঙ নেই। এমনকি একটা প্যাস্টেলও। অবাক হয়েই তাতান জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রঙ কর না বুঝি?'

'রঙ, হ্যাঁ করি তো। কিন্তু এটা খালি স্কেচের খাতা। কোথাও গেলে নিয়ে যেতে সুবিধে হয়। আর রঙ লাগলে না হয় তোমাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে নেব, কি দেবে তো?' হেসে ফেলল সবাই। তাতান বলল, 'আর আমরা কি আঁকব আজকে?'

'তোমরা যা খুশি তাই আঁকবে। তুমিই বল না তোমার কি আঁকতে ইচ্ছে করছে?'

সবাই কিছু না কিছু বলল। কেউ বটগাছ, কেউ কলাগাছ, কেউ পাহাড় আঁকতে বসে গেল। বাকী রয়ে গেল শুধু তাতান।

'কি তাতান, তুমি কি আঁকবে ঠিক করলে?'

তাতান আমতা আমতা করে বলল, 'আমাকে বলে না দিলে যে আমি কিছুই আঁকতে পারি না। আর যাই আঁকতে যাই ভুল হয়ে যায়। শেষে মাষ্টারমশাই একটু ঠিক করে দেন।'

'হুঁ, তোমার তো দেখছি গভীর সমস্যা'। ভুলু গালে হাত দিয়ে খানিক ভাবল। 'আচ্ছা, তোমার কি মন থেকে কিছুই আঁকতে ইচ্ছে করছে না?'

মাথা নাড়ল তাতান।

ভুলু আরও খানিকক্ষন কি সব ভেবে তাকে বলল, 'বেশ। তোমাকে কিছু আঁকতে হবে না। আজকে বরং আমার আঁকা দেখ, কেমন? তোমাকে একটা ধাঁধা দিচ্ছি। কোন তাড়া নেই। এক সপ্তাহ ভেবে পরের দিন আমাকে জানিও। একটা জিনিস তুমি জোর করে ধরে বেঁধে রেখেছ। তাই আঁকতে পারছ না। কেমন? যেই সেটা ছেড়ে দেবে, অমনি দেখবে তরতর করে আঁকতে পারছ।'

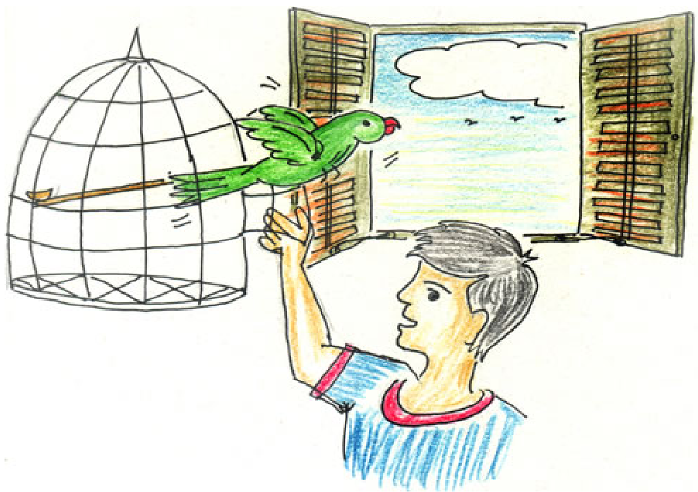

৪

রবিবার সন্ধ্যায় আড্ডায় বেরোনর সময় প্রনবেশ লক্ষ্য করলেন তাতান ছবি আঁকছে। দৃশ্যটা একটু অদ্ভুত; কারন তিনি কোনদিনই ছেলেকে আগে ছবি আঁকতে দেখেননি। তাঁর ধারনা ছিল তাতান আঁকতে ঠিক পারেনা। ভয় পায়। অথচ আজ সে অবলীলাক্রমে এঁকে চলেছে। একসময় সে ঘাড় ঘুরিয়ে বায়নার সুরে বলল, 'আসার সময় একটা আঁকার খাতা আনবে বাবা?'

প্রনবেশ হকচকিয়ে বললেন বললেন, 'হ্যাঁ, আনব। কেন আনব না।' যে ছেলে আঁকার ইস্কুলে যাওয়ার নামে ভয় পেত তাকে প্রান খুলে আঁকতে দেখে বড় তৃপ্তি পেলেন তিনি।

তাতানের মনে আজ ফূর্তির সীমা নেই। অন্যান্য রবিবারগুলোয় ঘন্টা দুয়েক ক্লাস হলেই উঠি উঠি করত মনটা। আজকে বাড়ি ঢুকে দেওয়াল ঘড়িটায় দেখল সাড়ে বারটা বেজে গেছে। ভুলুদা যেন ম্যাজিক জানে। ওরা সবাই যা বলছে তাই এঁকে দিচ্ছিল। নাহ, আঁকাটা শিখতেই হবে। এই ভেবে মহানন্দে তাতান স্নান করতে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে মাথায় খেলছিল ধাঁধাটাও।

বারান্দায় টিয়াপাখিটা বসে বসে ছোলা খাচ্ছিল। অন্য সময় হলে হয়তো তাতান ওকে কিছু বলত। আজকে আর সেদিকে হুঁশ নেই। কিন্তু মাথায় একমগ ঠান্ডা জল ঢালার সাথে সাথেই যেন পট করে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। আরে, তাই তো। হ্যাঁ, এটাই তো। নিশ্চয়ই। হতেই হবে। কোন রকমে গায়ের জল মুছে ছুটতে ছুটতে হাজির হল পাখির খাঁচার কাছে। আর চুপিচুপি একটা টুলে উঠে খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'পালা।' ব্যস আর পায় কে, পাখিও ফুড়ুত হাওয়া। তারপর থেকে পরপর আটখানা ছবি এঁকে ফেলেছে তাতান। আজ আর তাকে পায় কে।

অভ্র পাল
কারডিফ, ওয়েলস, যুক্তরাষ্ট্র

কেকিকোকা, দ্য মুশকিল আসান

১

ছুটি পড়েছে স্কুলে। চার বন্ধু কিংশুক, কেকা, কাবেরী আর কোজাগর রোজ বিকেলে ক্যারাটে শিখতে যায় কাছাকাছি এক ক্লাবে। সেখান থেকে ফিরে জড়ো হয় পার্কে। একটু খেলাধূলো আর অনেকটা আড্ডা মেরে সন্ধ্যের সময় যে যার বাড়ি ফেরে। পার্কটাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যে 'সুচেতনা' রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, এদের সবার বাড়ি সেখানেই।

আজ পার্কে ঢুকে সাইকেলটাকে স্ট্যান্ড করে রেখেই কেকা বলল
- একটা মুশকিলে পড়েছি।
- কিরকম মুশকিল?
- সারাদিন গল্পের বই পড়তে ভালো লাগে না, টিভি দেখতেও ইচ্ছে করে না। পছন্দসই অন্যরকম কিছু একটা কাজ চাই। কী করা যায় বলতো?

কিংশুকও মুখ ব্যাজার করে বলল
- হ্যাঁ আমারও ঐ একই মুশকিল। ভিডিও গেমস খেলতেও ইচ্ছে করে না আজকাল। কিছু ইন্টারেস্টিং কাজ পেলে খুব ভালো হত।

কাবেরী বলল
- আমারও একই দাবী। ভালোলাগে না রোজ এই একঘেঁয়ে ছুটি কাটাতে।

কোজাগর ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে তড়বড়িয়ে বলে উঠল
- কেকিকোকা?

সবাই মিলে জিগ্যেস করল
- কেকিকোকা? এটার মানে কি?
- কেকিকোকা মানে কে কি ধরনের কাজ চাস, কোন সময় কাজ করতে চাস, কোথায় বসে কাজ করবি, কাজের জন্যে কাদেরকে সঙ্গে চাস ইত্যাদি প্রভৃতি আর কি। মানে কোনো বিষয় নিয়ে যা যা প্রশ্ন করা যেতে পারে সেগুলোকে এককথায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় – 'কেকিকোকা'।

কিংশুক কোজাগরের পিঠে একটা বিশাল চাপ্পড় মেরে বলল
- ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া।
- কেকিকোকা?
- মানে?
- এইতো বললাম মানেটা। আবার বলে দিতে হবে? মানে আইডিয়াটা কেন ব্রিলিয়ান্ট, ব্রিলিয়ান্ট হল তো কি হল, কোন কাজে লাগতে পারে আইডিয়াটা, কারই বা কাজে লাগবে ইত্যাদি প্রভৃতি।
- ওহ তাই বল। হ্যাঁ হ্যাঁ কাজে লাগবে। আমাদের সবার কাজে লাগবে।

কেকা, কাবেরীও খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল।
- বল, বল। শিগ্রী বল। কিভাবে কাজে লাগতে পারে?
- শোন আমরা একটা দল মানে একটা গ্রুপ বানাতে পারি। তার নাম হবে 'কেকিকোকা'।
- কি করব আমরা সেখানে?
- নাম যা বলছে তাই। মানে কোজাগর যেমন বলেছে সেই রকমই। আমরা যে কোন লোকের নানান কি, কেন, কোথায়, কারা, কিভাবে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেব।
- দেব বললেই দেওয়া যাবে নাকি। আমরা কি সব প্রশ্নের উত্তর জানি?
- আরে জানিনা তো কি জেনে নেওয়া যাবে। আমার কম্পিউটার আছে। ইন্টারনেটে খুঁজলে পাওয়া যায় না এমন কিছু নেই।

কেকা বলল
- তাছাড়া আমরা আমাদের বাড়িতে বড়দেরও জিগ্যেস করে জেনে নিতে পারি। আমার বাড়িতে একটা বিশাল লাইব্রেরী আছে সেখানে এমন কোন বই নেই যা নেই।
কাবেরী বলল
- আমাদের ক্যারাটে ক্লাবের পাশে 'জ্ঞান পাঠাগার' নামের যে লাইব্রেরীটা আছে তার আমি মেম্বার। দরকার পড়লে সেখানেও যেতে পারি আমরা।
- গ্রেট। তাহলে আর কি। চল নেমে পড়ি। কি রে কোজাগর তখন থেকে তুই চুপ যে। নতুন আইডিয়াটা কেমন লাগল বললি না তো।

কোজাগর বলল
- আইডিয়াটা যে ব্রিলিয়ান্ট সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। 'কেকিকোকা' নামের কিন্তু আরও একটা মানে আছে। এই নামটার মধ্যে আমাদের সবার নামের প্রথম অক্ষরটা লুকিয়ে আছে। কেকার 'কে', কিংশুকের 'কি', কোজাগরের 'কো' আর কাবেরীর 'কা' মিলিয়ে 'কেকিকোকা'।

কারো মাথায় এটা আসে নি আগে। সবাই বুঝতে পেরে খুব উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো
- তাই তো! হুররররে...
কোজাগর বলল
- 'কেকিকোকা'-র সঙ্গে 'বাঁটুল দ্য গ্রেট'-এর 'দ্য গ্রেট'-এর মতো 'দ্য মুশকিল আসান' জুড়ে দিলে কেমন হয়। আমরা লোকেদের মুশকিল আসান করতে চাই। আর সেই সঙ্গে নিজেদের সময় কাটানোর মুশকিলেরও আসান হবে।

- 'কেকিকোকা, দ্য মুশকিল আসান'। জমাটি নাম।
- দুর্দান্ত! গ্রুপের নাম তাহলে এটাই ফাইনাল করা হল।

সবাই একবাক্যে মেনে নিল।

২

কিংশুকদের বাড়িতে ওর পড়ার ছোট্ট ঘরটা 'কেকিকোকা'-র অফিস ঘর হিসেবে চিহ্নিত করা হল। এই ঘরে একটা কম্পিউটার আছে। এটা একটা বিশাল উপরি পাওনা ওদের। বাড়ির লোকেরা কেউ কোন আপত্তি করল না। বরং নিশ্চিন্ত হল যে ছেলেমেয়েগুলো সাইকেল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে না বেড়িয়ে ঘরবন্দী কাটাবে কিছুক্ষন।

কম্পিউটারে ছবি এঁকে 'কেকিকোকা, দ্য মুশকিল আসান' লিখে পোস্টার বানালো কিংশুক। সঙ্গে জুড়ে দিল তাদের নতুন অফিসের ঠিকানা সহ ম্যাপ। আর কাবেরীর ফোন নাম্বার। ওদের মধ্যে একমাত্র কাবেরীরই নিজস্ব মোবাইল আছে। নতুন একটা ইমেল আইডি বানিয়ে সেটাও জুড়ে দিতে ভুললো না। তারপর লিখল

'প্রশ্ন আছে কিন্তু উত্তর জানা নেই? যোগাযোগ করুন। ফ্রী সার্ভিস।

'ফ্রী সার্ভিস' নিয়ে একটু দ্বিধায় ছিল সবাই। কিন্তু ঠিক করা হল আপাততঃ কিছুদিন বিনা পয়সাতেই কাজ করে অভিজ্ঞতা বাড়ানো হবে। লোকজনের আস্থা অর্জন করতে পারলে নিজেদের মনোবল বাড়বে। তখন কিছু পারিশ্রমিক নেওয়া চলতে পারে। সেই মতো পোস্টারও বদলে দেওয়া হবে তখন।

তারপর ছাপিয়ে বার করল সেই পোস্টার। সাদাকালো প্রিন্টারে ছাপানো বলে দেখতে একটু ম্যাড়ম্যাড়ে লাগছিল। কাবেরী আর কোজাগর সঙ্গে সঙ্গে রং তুলি নিয়ে বসে গেল। আধঘন্টায় কুড়িটা পোস্টার দেখতে ঝকঝকে আকর্ষনীয় হয়ে উঠলো। তারপর যে যার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে পোস্টার, আঠা, সেলোটেপ, কাঁচি ইত্যাদি যা যা লাগতে পারে। পার্কের সব দিকের গেটে, পার্কের মধ্যে বড় বড় কয়েকটা গাছের গায়ে প্রথম পোস্টার আঁটা হল। তারপর কমপ্লেক্সের বাইরে চৌরাস্তার মোড়ে কয়েকটা আর বিশুদার মুদির দোকানের গায়ে, কাগজ ও ম্যাগাজিনের স্টলের পাশের লাইট পোস্টটায়। টেলিফোন বুথের সামনে। আরো যেখানে যেখানে নজরে পড়ল লাগিয়ে দিল।

আজকের মতো কাজ শেষ। সবার মনেই এখন 'কেকিকোকা' টাইপের অনেক প্রশ্ন জমে উঠেছে। পোস্টার তো লাগানো হল। কিন্তু পোস্টারটা কারো কি নজরে পড়বে? কারো কি বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে? কেউ কি আসবে? কেউ কি ফোন বা ইমেল করবে? করলেও কবে করবে? এসবের উত্তর ওদের জানা নেই। একমাত্র সময়ই বলতে পারে কি হবে। তাই এখন শুধু অপেক্ষা করে থাকা।

চৌরাস্তার মোড়ে সুদীপ কাকুর রোলের দোকানটা চোখে পড়তেই সবার খুব রোল খিদে পেয়ে গেলো। চারটে এগরোল অর্ডার দিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ কোজাগর বলল
- দ্যাখ বিশুদার মুদির দোকানের বাইরে একটা লোক আমাদের পোস্টারটা খুব মন দিয়ে দেখছে।

সবাই তাই দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ল। কিংশুক বলল

- চল চল লোকটির সঙ্গে কথা বলে দেখি। কি ভাবছেন কিছু যদি জানা যায়। কেকা, কাবেরী তোরা রোলটা নিয়ে আয়।

কোজাগর আর কিংশুক রাস্তা পেরিয়ে ভদ্রলোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ভদ্রলোকটি এক মনে তাকিয়ে রয়েছে পোস্টারের দিকে। কি যেন ভাবছেন। খুব চিন্তাচ্ছন্ন মুখ।
- কিছু ভাবছেন কাকু?
- আচ্ছা, এই পোস্টারটা আগে তো চোখে পড়েনি কখনো।
- হ্যাঁ আজই মারা হয়েছে। আপনার কি জানার মতো কোন প্রশ্ন আছে?
- আছে। কিন্তু কোন কাজ হবে মনে হয় গেলে? ফ্রীতে সার্ভিস দেবে বলেছে। ভরসা করা যাবে?
- ফ্রীতে যখন সার্ভিস দেবে তখন তো আপনার হারানোর কিছু নেই। টাকা পয়সা তো আর মার যাচ্ছে না। বরং লাভ হলেও হতে পারে। একটু দেখুনই না হয় বিশ্বাস করে।
- তা অবশ্য মন্দ বলোনি। তোমরা জানো কোথায় এদের অফিস?
- আসলে আমরা চারবন্ধু মিলে এই গ্রুপটা ফর্ম করেছি। আপনি যদি আমাদের ভরসা করতে পারেন তাহলে আমরা আমাদের অফিসে গিয়ে বসে কথাবার্তা বলতে পারি।

ভদ্রলোক একথা শুনে ভীষন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এত বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে দেখে বিশেষ ভরসা করলেন বলে মনে হল না। ততক্ষনে কেকা আর কাবেরীও রোল নিয়ে হাজির হয়েছে। সবাই মিলে চেপে ধরল।
- কাকু, আমাদের ওপর একটু ভরসা করে দেখুন। ক্ষতি হবার তো কিছু নেই।
ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে বললেন
- ঠিক আছে। চলো তোমাদের অফিসে গিয়ে বসে কথাবার্তা বলা যাক।

ভদ্রলোকের বাইক রাখা ছিল সামনেই। বাইকে স্টার্ট দিলেন। ওরা চারজনে সাইকেল চালিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

৩

সবাই মিলে ঢুকলো ওদের অফিস ঘরে। কেকা ভদ্রলোককে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল বসার জন্যে। কিংশুক ভেতর থেকে এক গ্লাস জল এনে দিল।

কোজাগর শুরু করল কথাবার্তা
- কাকু, আপনার নামটা একটু বলুন।
- আমার নাম মিহির মজুমদার।
- আপনার প্রশ্ন কি?
- আমার বাড়ির পোষা কুকুর বাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ ভ্যানিস করে গেল কি করে?

কিংশুক ততক্ষনে তার কম্পিউটার অন করে ফেলেছে। লিখতে শুরু করেছে তাদের 'কেকিকোকা দ্য মুশকিল আসান'-এর প্রথম প্রজেক্টের সব খুঁটিনাটি।

নাম – মিহির মজুমদার।
প্রশ্ন – বাড়ির ভেতর থেকে পোষা কুকুর হঠাৎ কোথায় ভ্যানিস করে গেল?

কোজাগর জানতে চাইল – কী কুকুর?
– স্পিৎজ। ছোট্ট সাদা কুকুর। নাম জিমি।
– কোন দিন ও কোন সময় ঘটেছে ঘটনাটা?
– তিনদিন আগে। দুপুর বেলা। বাড়িতে আমরা সবাই ঘুমাচ্ছিলাম। কুকুরটাও বাড়িতেই ছিল। ঘুম থেকে উঠে থেকে কুকুরটাকে আমরা আর কেউ দেখতে পাইনি।
– বাড়িতে কে কে ছিলেন সেই সময়?
– সবাই ছিলাম। আমি, আমার স্ত্রী সুমিতা, দুই মেয়ে রিয়া আর দিয়া, আমার বয়স্ক মা আর বাবা।
– কুকুরটাকে কেউ চুরি করতে পারে কি? কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?
– না, সেরকম কখনো মনে হয়নি।
– ঘরের দরজা কি খোলা ছিল? কেউ উঠে আসতে পারে ওই সময়?
– না। নিচের মেন দরজা বন্ধই ছিল।
– আচ্ছা, আমরা কি আপনার বাড়িটা গিয়ে একবার দেখে আসতে পারি।
– নিশ্চয়। এখনই চলো আমার সঙ্গে।

ওনার বাড়ি চৌরাস্তার খুব কাছেই। ওরা সবাই গিয়ে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল সবকিছু। মিহিরবাবুর দোতলা বাড়ি। পাশাপাশি অনেকগুলো একইরকম বাড়ি। নিচে ওনার বয়স্ক মা বাবা থাকেন। ওপরে থাকেন উনি, ওনার স্ত্রী আর দুই মেয়ে। মেয়েরা ছোট। দিয়া হাঁটতে শিখেছে সবে। রিয়া স্কুলে যায়। ক্লাস টু তে পড়ে। ছাদে অনেক ফুলগাছের টব। সব কিছু ভাল করে দেখল ওরা। কিছু মাথায় এলো না কারো। সবার সঙ্গে কথা বলে শুধু একটা নতুন খবর পেল। মিহিরবাবুর মা বললেন ওনার আলমারির চাবিটাও সেদিন থেকে খোওয়া গেছে। উনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ঘুম এসে যেতে চাবিটা বিছানাতেই খবরের কাগজের ওপরে রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। উঠে থেকে আর চাবিটা দেখতে পাচ্ছেন না।

মিহির বাবু বললেন
– মা ওরকম প্রায়ই এটা সেটা হারিয়ে ফেলে। আসলে কোথাও নিশ্চয় যত্ন করে তুলে রেখেছে। এখন আর মনে পড়ছে না। এই ব্যাপার নিয়ে তোমাদের ভাবার কিছু নেই। দুদিন পরেই ও চাবি খুঁজে পাওয়া যাবে।

যাইহোক কুকুরের একটা ফটো নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে এলো।

৪

বাড়িতে এই নিয়ে অনেক আলোচনা চলল চার বন্ধুর মধ্যে। চাবি হারানোর সঙ্গে কুকুর হারানোর কোন সংযোগ খুঁজে বার করতে পারল না কেউই। তাই চাবি হারানোর ব্যাপারটা আপাততঃ গুরুত্ব না দিয়ে ককুর রহস্য ভেদ করাই প্রথম লক্ষ্য বলে ঠিক করল ওরা।

কেকা বলল

- আমরা তো আশেপাশের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি কেউ দেখেছে কিনা কুকুরটাকে।
- আশেপাশে তো অনেক বাড়ি। কটা বাড়িতে যাবি?
- অন্ততঃ ঐ ব্লকটার সব বাড়ি।

সেই মতো ওরা বেশ কয়েকটা বাড়িতে খোঁজ নিল। কেউ তেমন কিছু বলতে পারল না।

মন খারাপ করে সবাই এসে জড়ো হল পার্কে। কি করা যায় বুঝে উঠতে পারছে না। ফটোটা হাতে নিয়ে চারজনে আলোচনা করছে। হঠাৎ একটা মহিলা এসে বললেন,
- এই কুকুরটাকে কি তোমরা খুঁজছ? আমি এরকম একটা সাদা কুকুর দেখেছিলাম।
একটুকরো আশার আলো দেখে সবার চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো
- কবে? কোথায়?
- দু-তিন দিন আগে। রাস্তার ধারে চুপ করে বসে ঝিমোচ্ছিল। মনে হল খুব শরীর খারাপ। আমি বাড়ি এনে জল দিলাম, খেতে দিলাম। খেতে চাইল না। ঝিম মেরে বসেছিল। পায়েও চোট ছিল। পা ফেলে হাঁটতে পারছিল না।
- তারপর কি করলেন?
- আমি বাড়িতেই রাখতে চেয়েছিলাম। কুকুরটাকে দেখে খুব মায়া হচ্ছিল। কিন্তু আমি তো আমার নিজের বাড়িতে থাকিনা। একজনদের বাড়িতে কাজ করি। সেখানেই থাকি। ঐ বাড়ির কেউ কুকুর পছন্দ করে না। কুকুরটা বাড়িতে এনেছি দেখে খুব রেগে গেল আমার ওপর। কোথাকার না কোথাকার কুকুর তাও অসুস্থ। কিছুতেই রাখতে দিল না। আমি আর কি করি। কুকুরটাকে আবার রাস্তায় ধারে ছেড়ে দিয়ে এলাম। কুকুরটা নিশ্চয় আর বেঁচে নেই।

মুখটা খুব দুঃখী করে দাঁড়িয়ে রইলেন মহিলাটি। কিংশুক বলল
- আপনি যদি ওকে কুকুরদের রেস্কিউ সেন্টারেও দিয়ে আসতেন।
- রেস্কিউ সেন্টার কি?
- এটা কুকুরদের অনাথ আশ্রমের মতো। যে সব কুকুরদের কোন মালিকানা নেই, হারিয়ে গেছে বা অসুস্থ তাই কেউ নিতে চায় না তাদেরকে আশ্রয় দেয় এরা। থাকতে দেয়, খেতে দেয়, ডাক্তার দেখায়। ওখান থেকে লোকজন বাড়িতে পোষার জন্যেও কুকুর নিয়ে যেতে পারে।
- এরকম আছে নাকি এখানে?
- হ্যাঁ দু-তিনটে আছে। আমি একবার একটা বাচ্চা কুকুরকেকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে দিয়ে এসেছিলাম 'ডগ লাভারস' নামের এক রেস্কিউ সেন্টারে।

কোজাগর বলল
- হয়তো তোর মতো কেউ সেভাবে কুকুরটাকে রাস্তা থেকে ধরে ওরকমই কোন এক রেস্কিউ সেন্টারে দিয়ে এসেছে।
- সেটাও হতে পারে অবশ্য।
- চল তাহলে, সেগুলো ঘুরে খোঁজ নিয়ে আসি।

অফিসে ফিরে গিয়ে ওরা চট করে কম্পিউটারে দেখে নিল এই শহরের মধ্যে কটা রেস্কিউ সেন্টার আছে। সব কটার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার টুকে নিল। তারপর একে একে প্রত্যেকটাকে ফোন

লাগাল। জিগ্যেস করল দিন তিনেকের মধ্যে কোন সাদা স্পিৎজ কুকুর ওরা উদ্ধার করেছে কিনা বা কেউ দিয়ে গেছে কিনা। 'লাভ এন্ড কেয়ার ফর এনিম্যালস' নামে একটা সংস্থা জানাল তারা একটা সাদা কুকুর পেয়েছে। ঐ সংস্থারই এক কর্মী কুকুরটাকে রাস্তায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে তুলে এনেছে। মাথায় আর পায়ে চোট ছিল। এখন ওষুধ দেওয়ার পর অনেকটাই ভাল আছে। যদিও এখনও পায়ে ব্যান্ডেজ করা আছে। তক্ষুনি সবাই সাইকেল নিয়ে ছুটলো।

কুকুরটাকে ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে মনে হল এটাই জিমি। 'জিমি' বলে ডাকতেই কুকুরটা তাকিয়ে দেখল। লেজও নেড়ে নিল একটু। তখন তারা একদম নিশ্চিত হল। মুখে হাসি ফুটে উঠল সবার। কাবেরী ফোন লাগাল মিহিরবাবুকে। সব কথা শুনে মিহিরবাবু বললেন
- তোমরা ওখানেই থাকো। আমি এক্ষুনি আসছি।
বাইক নিয়ে আধঘন্টার মধ্যেই এসে হাজির হলেন তিনি। ওনাকে দেখেই জিমি তার খোঁড়া পা নিয়েই ছুটতে ছুটতে এসে লাফাঝাঁপি শুরু করে দিল। মিহিরবাবু তাকে কোলে নিয়ে কেঁদেই ফেললেন।

কেকা বলল
- কুকুরদের প্রতি এমন ভালোবাসা পড়ে যায়। যেন ওরা বাড়িরই একজন সদস্য। যাক বাবা শেষ পর্যন্ত জিমিকে খুঁজে পাওয়া গেল।
মিহিরবাবু বললেন
- আমি তোমাদের আন্ডার এস্টিমেট করেছিলাম। তোমরা তো দেখছি খুব কাজের ছেলেমেয়ে। চলো আমার বাড়ি চলো। খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি যাবে। তোমরা যে আমার কতো বড় উপকার করলে তা তোমরা জানো না।

৫

সবাই মিলে খুব হৈ হৈ করতে করতে চলল মিহিরবাবুর বাড়ি। কোজাগরের মুখে শুধু হাসি নেই।
- তোর মুখ ব্যাজার কেন রে। আমরা আমাদের ফার্স্ট প্রজেক্ট এত ভালোভাবে কমপ্লিট করলাম। তুই খুশি হলি না?
- কিন্তু কুকুরটার পা ভাঙ্গলো কি করে? সেটা তো বুঝতে পারছি না। আর চাবিটাই বা কোথায় গেল?

কাবেরী বলল
- চাবিটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়। মিহিরবাবুর মার অনেক বয়স হয়েছে। নিশ্চয় কোথাও রেখেছেন যত্ন করে। তারপর ভুলে গেছেন। বা খাট থেকে পড়ে গেছে নিচে।
- তাহলে আমরা খাটের তলাটা সার্চ করে দেখলে পারি তো?
- দেখা বেশ অসুবিধেজনক। সেদিন আমি নিচু হয়ে খাটের তলাটা দেখেছিলাম। কতো জিনিস যে জড়ো করা আছে? অত কিছু বার করা বেশ ঝামেলা।

কিংশুক বলল
- ঝামেলা হলেও আজ আমরা একবার চেষ্টা করে দেখতেই পারি। ওখানে থাকব তো অনেকক্ষন।

সময়ের অভাব হবে না।
কোজাগর আবার ফিরে এলো সেই পুরনো প্রশ্নে।
- কিন্তু কুকুরটার পা ভাঙ্গলো কি ভাবে? এমন নয় যে ও ছাদে উঠেছিল। ছাদ থেকে নিচে পড়ে গেছে?
- শুধু শুধু পড়তে যাবে কেন? ছাদে তো পাঁচিল আছে।

মিহিরবাবুর বাড়িতে পোঁছে কলিং বেল বাজানো হল। ওনার মা খুলে দিলেন। কুকুরকে ফিরে পেয়ে বাড়ির সবার আনন্দ আর ধরে না। মিহিরবাবু বললেন
- সুমিতা। এদেরকেও ধরে আনলাম। এরা না থাকলে জিমিকে আমরা খুঁজে পেতাম না। 'ডিকিজ কিচেন'-এ ফোন করে আমাদের সবার জন্যে চাউমিন আর চিলি চিকেন অর্ডার করো। এরা খেয়ে তবে বাড়ি যাবে।

জিমি ঐ খোঁড়া ব্যান্ডেজ করা পা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে নামছে। সবার কাছে আদর খাচ্ছে। বাড়ি ফিরে এসে ওরও যে কত আনন্দ হচ্ছিল তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

কাবেরী মিহিরবাবুর মাকে বলল
- আচ্ছা দিদা আপনি সেই চাবীটা এখনো খুঁজে পাননি তাই না?
- না ওটা আর পাওয়া গেল না। কিন্তু জানো আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি খবরের কাগজের ওপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কিংশুক বলল
- আপনার খাটের তলাটা আমরা একটু খুঁজে দেখতে পারি? যদি পড়ে গিয়ে থাকে।
- দেখো না। কিছু অসুবিধে নেই।

মিহিরবাবুর কাছ থেকে একটা টর্চ চেয়ে নিল ওরা। তারপর খাটের তলা থেকে সব টেনে বার করে টর্চ দিয়ে তন্নতন্ন করে দেখল ভেতরটা। না, চাবি খুঁজে পাওয়া গেলনা।

এমন সময় একটা কাক হঠাৎ জানলায় কার্নিসে বসে বেজায় কা কা করে চীৎকার আরম্ভ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে জিমি কোথা থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জানলায়। পারলে কাককে এক্ষুনি আক্রমন করে। আর কাকটা এই দেখে ভয় পেয়ে উড়ে গেল। জিমিও ছুট দিলো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে।

কোজাগর বলে উঠলো
- ঠিক ঠিক। আমি এই বার বুঝতে পেরেছি জিমির পা ভেঙ্গেছিল কি করে।
- কি করে?

সবাই অবাক হয়ে যায় ওর কথা শুনে।
- তোরা চল আমার সঙ্গে ছাদে।

চার বন্ধুতে হুড়মুড়িয়ে ছাদে ওঠে। দেখে ছাদের পাঁচিলের গায়ে সামনের দু'পা তুলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিমি চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কাকটা উল্টোদিকের বাড়ির ছাদে বসে সমানে কা কা চীৎকার করে চলেছে।

কোজাগর ওখানে দাঁড়িয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষন করল। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো
- ঐ যে ঐ দেখ ঐ বাড়িটার পাশে যে পেয়ারা গাছটা আছে তার একটা ডালে কেমন চাবিটা ঝুলছে। কাক ব্যাটা সেদিন সবাই ঘুমাচ্ছে দেখে নিশ্চয় জানলা দিয়ে ঢুকে এসে চাবি নিয়ে পালাচ্ছিল। আর ওকে পিছু করতে গিয়ে জিমি ছাদে উঠে এসেছিল। তারপর কাক ধরার জন্যে ঝাঁপ মেরেছিল। তাতেই পড়ে গেছে। তারপর মাথায় চোট লাগায় বাড়িও চিনতে পারে নি বেচারা। রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে থাকবে। পায়ের ব্যাথাতেও কাবু হয়েছিল নিশ্চয়। এপাশে কাকের মুখ থেকেও চাবিটা ফসকে পেয়ারা গাছে পড়েছে। আর সেই ডালেই ঝুলে রয়েছে সেদিন থেকে।

চাবি ও কুকুর দুই-ই শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হল। তারপর খাওয়া হল জমিয়ে। মনের আনন্দে ওরা ফিরে গেল যে যার বাড়ি।

একসপ্তাহ পরে ওদের অফিসের ঠিকানায় 'কেকিকোকা, দ্য মুশকিল আসান'-এর নামে একটা পার্সেল এলো। খুলে দেখা গেল চারজনের জন্যে চারটে হাতঘড়ি পাঠিয়েছেন মিহিরবাবু। পারিশ্রমিক হিসেবে নয়। ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার উপহার হিসেবে। ওদের প্রথম রোজগার।

রুচিরা
বেইজিং, চীন

হাতি শিকার

হাতি শিকার

গরুমারা অভয়ারণ্যে একটা দাঁতাল হাতি হঠাত করেই পাগল হয়ে গেছে। দুলছুট হয়ে সেই হাতি এখন লাটাগুড়িতে তান্ডব চালাচ্ছে। বাড়ি ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সাধারণ গরিব মানুষের। অনেক গুলো দোকানও তছনছ করে দিয়েছে সেই পাগলা হাতিটা। বন দপ্তরের লোকেরা এখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে হাতিটাকে। টিভির পর্দায় এখন লোকাল চ্যানেলের নিউজ রিডারের মুখ। বহুদিন পর শান্তশিষ্ট শহরে এক জবর খবর পাওয়া গেছে। তাই চোখ মুখ বড় করে হাতির সংবাদটা যতটা পারা যায় চমকে দেবার মতো করে পরিবেশন করছেন ভদ্রলোক।

টিভিতে নিউজ চ্যানেলের সংবাদটা দেখছিল ক্লাস এইটের মিকি। দশটা বেজেছে, বাবা চলে গেছেন অফিসে। মা আর দুখিদাদা রান্না ঘরে, জোর মাংস রান্নার গন্ধ বেরোচ্ছে সেখান থেকে। একটু আগেই একবাটি মাংস চেখে এসেছে মিকি। সামার ভ্যাকেশন চলছে স্কুলে। একগাদা অংক করতে দিয়েছেন প্রাইভেট টিউটর, সেইসব গাদা গুচ্ছের হোম ওয়ার্ক সময়ে শেষ করা নিয়ে বড় ভাবনায় আছে মিকি। এমনিতেই অংকে সে অষ্টরম্ভা। তারমধ্যে টেনশানে থাকলে মিকির ক্ষিদে বেড়ে যায়। একবাটি মাংস এইমাত্র খেয়েও একটু যেন খিদে খিদে পাচ্ছে মিকির।

সিঁড়িঘরে বসে আরও একবাটি মাংস তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতেই মাথায় আইডিয়াটা এসেছে মিকির। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছে কিকুকে। মিকির ক্লাসমেট কিকু আবার অংকে জিনিয়াস। কিকু হাসতে হাসতে বললো, কী রে অংক পারছিস না বুঝি?

ফিসফিস করে মিকি বললো, রাখ তোর অংক। একটা জোর খবর শুনলাম এইমাত্র। লাটাগুড়িতে একটা পাগলা হাতি বেরিয়েছে। ঋজুদা আর রুদ্রর শিকারের গপপো পড়ে খুব এডভেঞ্চার এডভেঞ্চার করছিলো না কদিন ধরে? ভগবান সুযোগ করে দিয়েছেন এবার। বল যাবি হাতিশিকারে?
আকাশ থেকে পড়েছে কিকু, বলিস কি? কোথায়?

মিকি নিচু গলায় বললো, কেন লাটাগুড়ি।

কিকু ভোম্বলের মতো থমকে থেকে বলেই ফেললো, কী দিয়ে শিকার করবি হাতি?

মিকি চাপা গলায় বললো, কেন? জন্মদিনে বাবার দেওয়া এয়ার গানটা দিয়ে।

এয়ার গান দিয়ে হাতি শিকার? কিকু অবাক হয়ে বললো খেপেছিস নাকি? ওই অতবড় হাতির কাছে তোর এয়ারগানের গুলি তো নস্যি।

ভ্যাট বোকা, মিকি আশ্বাস দিলো কিকুকে, তুই ভুলে যাচ্ছিস যে হাতির সব চাইতে দুর্বল জায়গা হল ওর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ জোড়া।

তো? কিকু এখনো ধাঁধায় রয়েছে যেন।

মিকি একটু বিজ্ঞের মতো হাসলো। আমার হাতের টিপতো তুই জানিসই। মেলায় যে বন্দুকের দোকান গুলো থাকে, সেখানে বেলুন ফাটাই দেখিস না। একটাও মিস হয় বল?

কিকু নিরুত্তর। মিকি অভয় দেওয়ার মতো করে বললো ভাবিস না। রেঞ্জের মধ্যে যাওয়াটারই শুধু অপেক্ষা। একবার পেলেই ঢ্যা ঢ্যা করে গুলির বৃষ্টি ব্যস। চোখ দিয়ে মগজে ঢুকে যাবে গুলি আর সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে হাতিটা, সিম্পল।

কিকু চুপ। মিকি বললো, হাতি-শিকার পর্বটা ঠিকঠাক নামিয়ে দিতে পারলে লাটাগুড়ির গরিব লোকজনদের যেমন উপকার হবে, আমরাও কি মাইলেজ পাবো একবার ভাব কিকু। চাই কি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা পুরষ্কারও জুটে যেতে পারে আমাদের।

বাড়িতে বলবি না? কিকু ভয়ে বললো।

ওরে রামছাগল বাড়িতে বললে কি আর বাবা-মা যেতে দেবেন নাকি কখনও! মিকি বললো, সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরোবো। লাটাগুড়ি এখান থেকে জোর এক ঘন্টার মামলা। যাওয়া আসা ধরলে আড়াই তিন ঘন্টা। অপারেশান শেষ করে সন্ধ্যেবেলার মধ্যেই বাড়ি ঢুকে যাবো। নো টেনশান।

কাল দুপুরে করালী স্যারের কাছে অংকের টিউশান, সেটা বলতে যাচ্ছিলো কিকু। কিন্তু বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে মিকি বললো, তাহলে ওই কথাই রইলো। কাল আমরা সকাল ন'টায় বেরোচ্ছি বাড়ি থেকে। আর হ্যাঁ বাড়ি থেকে বেরোবার আগে পেট ভরে ভালো করে খেয়ে নিস, আমিও খেয়ে নেবো। পরে রাস্তায় কিছু জোটে কি না জোটে!

পরদিন বাবাও বেরিয়েছেন অফিসে, কাঁধে এয়ারগান ঝুলিয়ে মিকি সন্তর্পনে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়েছে। পুজোর সময় কেনা জিন্‌স্‌টা পড়েছে মিকি। গায়ে সেনাবাহিনীর মতো একটা জলপাই রঙের শার্ট। পা টিপে টিপে গলির মুখটায় গিয়ে হাঁফ ছেড়েছে সে। বেরোবার সময় মাকে বলেছে কিকুর বাড়ি অংক প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি। কিকুও একই কথা বলেছে বাড়িতে। মাটির একটা ভাঁড়ে টাকা জমাচ্ছিলো মিকি একবছর ধরে। সেটা ভেঙে বেশ কিছু টাকা পাওয়া গেছে। সে টাকা দিয়ে পকেট ভর্তি করে বেরিয়ে পড়েছে দু' বন্ধুতে।

সাধারণ একটা টি শার্ট আর প্যান্টের কিকু দাঁড়িয়ে ছিলো বাস স্ট্যান্ডে। মিকিকে দেখে বললো, তোর ড্রেসটা তো জব্বর হয়েছে।

মিকি বিজ্ঞের মতো বললো, জলপাই রঙের ড্রেস পরার অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে। হাতিটাকে আমি দেখবো কিন্তু সবুজ গাছপালার ব্যাকগ্রাউন্ডে সে আমাকে খুঁজে পাবে না।

ঠোঁট কামড়েছে মিকি, ইস, একটা ভুল হয়ে গেলো। তুইও যদি আর্মি টাইপ কোনো ড্রেস পরে আসতিস! যাক গে,ছেড়ে দে। মিকি গম্ভীর গলায় বললো, পরের বার আর এই ভুলটা করিস না। কিকু তারিফের গলায় বললো, নাঃ মানতেই হবে তোর ঘটে বুদ্ধি আছে কিছু!

বাসে ওঠার সময় মিকি বললো যদিও বাড়ি থেকে ভরপেট খেয়ে বেরিয়েছি, তবুও চল কোথাও কিছু খেয়ে নিই। পথে আবার কি জোটে কে জানে!

বাস স্ট্যান্ডের পাশেই একটা বিরাট মিষ্টির দোকান। সেই দোকানে খান দশেক পুরি দিয়ে সবজি আর বড় বড় চারটে রসোগোল্লা খেয়ে নিলো মিকি আর কিকু। কাঁধে এয়ার গান দেখে অনেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছিলো দুজনের দিকে। মুখ টিপে হাসছে সব। অপমানিত কিকু পেটে চিমটি কেটেছে মিকির। বিরক্তির গলায় মিকি বললো, ছাড় তো। বড় বড় কাজে বেরোলে এরকম সিলি ব্যাপারে একদম ধ্যান দিবি না। যখন ফিরবো হাতি মেরে, তখন দেখবি এই লোক গুলোই আমাদের অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করছে।

লাটাগুড়িগামী বাসে উঠেছে দু'জন। কন্ডাক্টর একটু কৌতুহলী চোখে তাকাচ্ছিলো দুজনের দিকে। সেদিকে থোড়াই কেয়ার মিকি আর কিকুর। গম্ভীর মুখে টিকিটের টাকা দিয়ে দিয়েছে লোকটার হাতে। এক চিলতে সাইজের দুটো টিকিট বুক পকেটে গুঁজে মিকি বললো, আমাদের এডভেঞ্চারের কথা কারো কাছে ফাঁস করে বসিস না যেন। প্রেসের লোকজন আজকাল খুব সেয়ানা। টের পেয়ে গেলে আমাদের পেছনে ডাকটিকিটের মতন সেঁটে যাবে ঠিক। কেস পুরো কেঁচে যাবে।

বাসের পিছন দিকে পাশাপাশি বসেছে মিকি আর কিকু। তিস্তা ব্রিজ আসতেই ময়নাগুড়ি আসতেই খিদে পেয়ে গেলো জোর। ভাগ্যিস সঙ্গে করে কিছু কলা এনেছিলো, চারটে করে মালভোগ কলা আর গোটা আষ্টেক লেডিকেনি খেয়ে নিয়েছে দুজন। বাসটা মৌলানী হয়ে লাটাগুড়ি এসে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। কাঁধে এয়ার গান, নেমেছে মিকি। পেছন পেছন কিকু। পথ চলতি লোকেরা ফিরে ফিরে দেখছে দুজনকে।

বাজারের মধ্যেই একটা বিরাট বড় মিষ্টির দোকান। সেখানে কাচের ওপাশে বিরাট বিরাট সব মিষ্টি। কাজু বরফি, প্যাঁড়া, ছানার জিলিপি, কালোজাম থেকে শুরু করে মোতিচূড়ের লাড্ডু পর্যন্ত সাজিয়ে রেখেছে ব্যাটাচ্ছেলে দোকানদার। জিভে জল না আসবার কোনো কারণ নেই। তবে এই দোকানের স্পেশালিটি হলো চমচম। এক একটা চমচম যেন এক একটা থান ইঁট। দোকানদার হেসে বললো এগুলো ফ্যামিলি সাইজ চমচম। বাড়ির সবাই মিলে যেমন একটা বড় কেক খায়, এই মিষ্টিও তেমনি সবাই মিলে শেয়ার করে খেতে হয়।

মিকি বললো, এখন বেরোবো জঙ্গলের দিকে। তারপর হাতি শিকার করে কখন ফিরি না ফিরি। খিদে পেয়ে যেতে পারে। তার চাইতে এখনই একটা একটা করে খেয়ে নিই চমচম। ওদিকটায় রসমালাই বানাচ্ছে, গন্ধ ছেড়েছে জোর। সেটাও একবাটি মেরে দিই চল। ছানার পোলাওটাও মিস করে ঠিক হবে না। আর সব শেষে একটা করে কাজু বরফি।

বুঝলি কিকু, মিকি একটুক্ষণ চিন্তা করে বললো, এখন এর বেশি খাওয়াটা ঠিক হবে না। বেশি খেয়ে ফেললে বিপদের সময় ব্রেন স্লো রেটে কাজ করবে। রিঅ্যাকশন টাইম বেড়ে যাবে। সেই রিস্ক নেওয়াটা

ঠিক হবে না।

অত টাকা সঙ্গে আছে তো? কিকু ভয়ে বললো, সব টাকা খেয়েই উড়িয়ে দিবি, ফেরার ভাড়া থাকবে তো রে?

কিকুর মাথায় একটা আলতো করে চাঁটি মেরে মিকি বললো, থাকবে রে বাবা থাকবে, ঘাবড়াসনা। অত না ভেবে এইবেলা খেয়ে নে। তবে একটা কাজ করলে হয় দুটো করে এই মেগা সাইজের চমচম সঙ্গে করে নিয়ে যাই, পরে জঙ্গলের মধ্যে কি জোটে না জোটে!

হাতে চমচমের বিরাট প্যাকেট দুলিয়ে বেরিয়েছে দুই বন্ধু। লাটাগুড়ি বাজার থেকে একটা রিক্সা ধরে কিছুটা গিয়ে নেওড়া মোড়। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে সামনেই জঙ্গল। কাঁধে এয়ার গান নিয়ে পথ হাঁটছে মিকি। পেছন পেছন কিকু। পান-সিগারেটের দোকানে আড্ডা মারছিলো কিছু লোক। একজন জিজ্ঞেস করলো এদিকে কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

নিরীহ মুখে মিকি বললো, পাখি শিকার করতে।

লোকটা দাঁত বের করে হাসলো, এদিকে তো ঘন জঙ্গল। এদিকটায় যেয়ো না। একটা পাগলা হাতি বেরিয়েছে এদিকে। খুব সাবধান।

কাউকে কিছু না বলে গুটিগুটি দুই বন্ধু এগিয়েছে জঙ্গলের দিকে। একটু বাদেই ঘন জঙ্গল শুরু হয়ে গেলো। যতদূর চোখ যায়, তার পুরোটা জুড়ে মোটাসোটা সব শাল গাছ একপায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরও কিসব অচেনা গাছ যেন সবুজ রঙের মশারি টাঙিয়ে দিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। গাছ গুলোর এত ঘন পাতা যে ওপর দিকে তাকালে আকাশ দেখা যায় না শত চেষ্টা করলেও। কি একটা অচেনা পাখি ডাকছে ঝুমঝুম শব্দ করে। পিলে যেন চমকে যায়! দিনের বেলাতেই সেই ছমছমে জঙ্গলে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

নির্ভীক মিকি কিকুকে অভয় দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। কিকু ঘাবড়েছে জোর। তার বুকের ভেতর ড্রিদিম ড্রিদিম শব্দ করে ঢাক বাজছে। পেটের মধ্যে একটা কচ্ছপ যেন লাফাচ্ছে থপথপ করে। পিলে-ফিলে যেন বেরিয়ে আসবে পেট ফেটে। কিছুটা পথ গিয়ে কিকু চিতকার করে বললো, মিকি ওই দেখ, ওই বড় শালগাছটার আড়ালে ওটা কি! কালো মতো উঁকি মারছে-ওটাই সেই পাগলা দাঁতাল হাতিটা না!

মিকি কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় গাছপালা নড়িয়ে হুড়মুড় করে সামনে চলে এসেছে একটা বিরাট বড় কালো রঙের হাতি। পাহাড়ের মতো তার আকার। তার শুঁড়টাই যেন দশটা মানুষের সমান লম্বা। ধবধবে সাদা তার দাঁত। পা তো নয় যেন গাব্দা গোব্দা রণ পা। খুদে খুদে চোখ হাতিটার। জুলজুল করে সে এখন তাকিয়ে আছে মিকি আর কিকুর দিকেই।

কিকু ঘাবড়েছে জোর। গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। তবুও কোনোমতে চিতকার করলো, মিকি টিপ কর, টিপ কর হাতির চোখে।

কোনো উত্তর আসছে না মিকির দিক থেকে। ঘাড় ঘুরিয়েছে কিকু। মিকি মাটিতে উবু হয়ে বসে চমচম খাচ্ছে দুর্ভিক্ষের দেশের লোকের মতো করে। বেকুবের মতো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে কিকু। মিকি অস্ফুটে বললো, খেয়ে নে কিকু, খেয়ে নে। পরে আর জোটে কি না জোটে!

হাতিটা অবাক হয়ে দেখছিলো দুজনকে। সাক্ষাত মৃত্যুকে সামনে দেখেও যারা প্রান বাঁচিয়ে পালাবার আগে শেষ খাওয়াটুকু খেয়ে নেবার কথা ভাবে, এমন দুই পেটুককে দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে হাতিটা। এমন অসম্ভব কান্ড জীবনে ঘটতে দেখেনি সে। কিছুক্ষণ বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল হাতিটা। তখনও মিকি আর কিকু চমচম খেয়ে চলেছে কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
জলপাইগুড়ি

নিনির সংসার

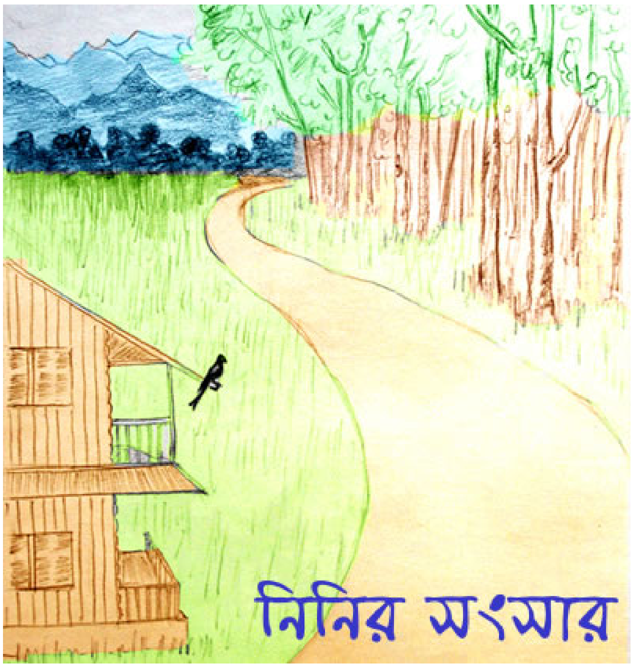

এক দেশে এক সুন্দর ছোট্ট মেয়ে থাকে। ফুলের মতো সুন্দর মেয়ে। মা আদর করে ডাকেন, 'নিনি'।

মা, বাবা আর নিনি। ছোট্ট সংসার। বাবা সারাদিন কারখানায় কাজ নিয়ে ব্যস্ত, বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। মাও সারাদিন অফিসে ব্যস্ত। দুপুরবেলা স্কুল থেকে ফিরে রোজ কান্না পায় নিনির। একা একা খাওয়া, টিভি দেখা, হোমওয়ার্ক করা, ছবি আঁকা, বই পড়া। ভালো লাগে নাকি? খুব কান্না পায়। একা একা ভয়ও করে। যেদিন ঝড়বৃষ্টি হয়, সেদিনগুলোয় তো খুব ভয় করে নিনির। মা ঠিক বুঝতে পারে। বৃষ্টি পড়লেই মা তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসে তাই।

এমনি দিনেও বিকেলে বাড়ি ফিরেই মা নিনিকে কোলে করে আদর করবে রোজ, চোখের জল মুছিয়ে দেবে, নিজে হাতে খাইয়ে দেবে, তারপর গল্প শোনাবে, গান শোনাবে, বাগানে গিয়ে ঝারি হাতে গাছে জল দেবে। তখন নিনিকেও জলে ভিজিয়ে দেবে। খুব মজা হয়। তারপর মা আর নিনি হাঁটতে বেরোয় রোজ।

নিনিদের বাড়িটা একটা পাহাড়ের কাছে। বিকেল হলেই নিনি মায়ের সঙ্গে পাহাড়ের দিকে হাঁটতে যায়। আঁকাবাঁকা রাস্তাটা যে কি সুন্দর। ছায়া ছায়া সবুজ ঝাঁকড়া গাছ দু'পাশে। কোনোটায় থোকা থোকা বেগুনী ফুল, কোনোটায় হলুদ, কোনোটায় গোলাপি। কখনো পলাশে লালে লাল, কখনো সাদা শিমুলে আকাশ ঢাকা পড়ছে এমন। লাল লাল কৃষ্ণচূড়া দেখলেই মা বলবে,'দ্যাখ নিনি,ঠিক যেন আকাশে আগুন লেগেছে।'

মোটেই আগুন মনে হয় না নিনির। আকাশটা এমনিই লাল হয়ে থাকে সর্বক্ষণ, কারখানার লাল ধোঁয়ায়। তবে কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো সেই লাল আকাশে দিব্যি লাগে, মানতেই হবে।

সব গাছে ফুল নেই, লম্বা লম্বা ছুঁচের মত পাতার সরলগাছ, বড় বড় পাতার শালগাছ, হাল্কা সোনালি

সবুজ পাতার সোনাঝুরি গাছ। সেই সঙ্গে কত ফলের গাছ। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আমলকি, ডুমুর। শেষ বিকেলে গাছে গাছে দল বেঁধে বেঁধে পাখি উড়ে আসে। লম্বা ল্যাজঝোলা পাখি, ছোট্ট টোপর মাথায় পাখি, কালো চকচকে কাক, ছোট্ট কালো কোকিল। সবুজ পাতার মতো টিয়া পাখি, সাদা ফুলের মতো দোয়েল পাখি। চড়াই, বুলবুলি, দুর্গাটুনটুনি, মৌটুসি। কত কত যে পাখি। চলা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে নিনি। পাহাড় পর্যন্ত যাওয়া হয় না, তার আগেই ঝুপ করে সন্ধে নেমে আসে।
বাবা বলেছে, একটা রবিবার সকাল সকাল পাহাড়ে নিয়ে যাবে। সে আর হচ্ছেই না। রবিবার বাবা মা দুজনেরই বাড়িতে কত কাজ।

আজকাল নিনি বন্ধুদের সঙ্গে বিকেলে খেলতে যায়। এক একদিন সবাই মিলে দল বেঁধে পাহাড়ের রাস্তায় যায়। এমনিতে বন্ধুদের পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ওরা বলে, পাহাড়ের চেয়ে পার্ক ভালো। কিন্তু নিনিকে যে পাহাড়টা বড্ড টানে।

মায়ের কাছে অরুণ-বরুণ-কিরণ মালার গল্প শুনেছে নিনি। পাহাড়ে গিয়ে লোভ করলে পাথর হয়ে যেতে হবে। মা বলে, পাহাড়ে গেলেই লোভ না করা শেখা যায়। নিনির খুব ইচ্ছে করে তাই। নিনি একলা একলাই বনের রাস্তায় যায় তখন।

মাঝে মাঝে বন্ধুরাও বনের কাছে ছুটে আসে। পাহাড়ে যাবার ইচ্ছে না হলেও বনের মধ্যেটায় খুব ভালো খেলা জমে যে। ঝাঁকড়া গাছের জঙ্গলে এলেই লুকোচুরি খেলতে ইচ্ছে হয়। 'টু উ উ কি' বলে ডাক দিয়ে পুপলু লুকিয়ে পড়বে মোটা কাঁঠাল গাছটার পেছনে, আর সেই শব্দটা বনের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে কত দূরে চলে যাবে। আওয়াজ শুনে পুপলুকে খুঁজতে গেলেই বোকা হতে হবে।
খুব মজা।

সেদিনও বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ের রাস্তায় যাচ্ছিল নিনি। দুপুরবেলা খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তাটায় জল, এদিক সেদিক ভাঙা গাছের ডাল পড়ে আছে, পাতায় পাতায় ভরে আছে রাস্তা, পাখিগুলো বিকেল বিকেল ফিরে এসে বাসা খুঁজে না পেয়ে কিচির মিচির করে খুব হল্লা জুড়েছে।

এক জায়গায় একটা গর্তমতো ছিল, সেটায় জল ভরে একটা ছোট্ট পুকুর হয়ে গেছে। পিঙ্কি আর বুবুন সেই দেখে বেজায় খুশি। জলে নেমে সে কি হুল্লোড়। মিলি আর প্রিয়ার আবার এসব পছন্দ না। 'ইস কি নোংরা তোরা', বলে মিলিদের বাড়ি খেলতে চলে গেল। বুম্বা আর পুপলু ঘুরে ঘুরে কাঁচা আম কুড়িয়ে পকেট বোঝাই করতে লাগল। কেউ পাহাড়ের দিকে যেতে চাইল না।

নিনির মনখারাপ করছিল। কোনো দিনই কি পাহাড়ের কাছে যাওয়া হবে না? আজকের আকাশটা কি সুন্দর। বৃষ্টির পর নীল আকাশের গায়ে পাহাড়টার রঙও নীল নীল। ভারি সুন্দর। একা একাই পাহাড়ের দিকে হাঁটতে লাগল নিনি। কোথা থেকে একটা ছোট্ট কুকুর ছুটে এসে ল্যাজ দোলাতে দোলাতে সঙ্গে চলল। ভালোই হল। আর একা একা যেতে হবে না নিনিকে। এখনও অনেকটা বিকেল আছে। আজ নিনি পাহাড় পর্যন্ত যাবেই।

একটু এগোতেই দেখল, কত পাখির বাসা ভেঙে মাটিতে পড়ে আছে। খুব ঝড় হয়েছিল যে। কি করবে পাখিগুলো! কাঠবেড়ালিরা এদিক সেদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে, ওদের বাসাগুলো কি হয়েছে কে জানে। যত রাজ্যের ছোট ছোট পোকামাকড় উড়ছে, ছোট ছোট জীবজন্তুরা সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। সবাই

কেমন গাছের মধ্যে, বনের মধ্যে ঢুকে থাকত, এখন ভয় পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।

আহা রে। সন্ধে হয়ে আসছে, কোথায় থাকবে ওরা? এই জঙ্গলে বাঘ-সিংহ নেই অবশ্য, কিন্তু শিয়াল আছে, বুনো কুকুরের দল আছে, মাঝে মাঝে মহুয়া খেতে ভালুকও আসে।
সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছিল নিনি।

আর একটু এগোতেই কুকুরটা জোরে ডাকতে ডাকতে একদিকে ছুটে গেল। কি একটা দেখে খুব জোরে চেঁচাতে লেগেছে, আর জোরে জোরে ল্যাজ নাড়ছে। নিনিও সেদিকেই এগিয়ে গেল।

ইস্ একেবারে বাচ্চা একটা খরগোশ। সাদা একটা তুলোর বলের মতো, নীল নীল পুঁতির মতো চোখ, লম্বা লম্বা হালকা গোলাপি কান, সে দুটো তিরতির করে কাঁপছে। খুব ভয় পেয়েছে বেচারা। কুকুর আর নিনিকে দেখে ভয় পেয়ে পা টেনে টেনে গাছের আড়ালে লুকোতে চাইছে। পারছে না। আহা রে, নিশ্চয় ওর পা ভেঙে গেছে। খুব কষ্ট হচ্ছে বোধহয়, দু চোখের কোণে জল। নিনি এগোতেই আরো ভয় পেয়ে খরগোশ এমন ছটফট করতে শুরু করল যে নিনিই ভয় পেয়ে গেল। কি বুঝে কুকুরটা নিজে থেকেই দূরে সরে গেল। নিনি খরগোশের মাথায় মুখে হাত বুলোতে লাগল। কি বুঝল কে জানে খরগোশটা, চুপটি করে নিনির হাতের পাতা জিভ দিয়ে চাটতে লাগল।
এদিক সেদিক দেখে একটা বড় শালপাতা এনে ওকে আস্তে করে তুলে নিল নিনি।এই জঙ্গলে, এখুনি অন্ধকার নামবে, ওকে একলা রেখে যাওয়া যায় নাকি!

কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু খুব হল্লা জুড়েছে আবার। সাবধানে শালপাতা ধরে এগিয়ে গেল নিনি। নিনিকে দেখে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে চুপ করল কুকুর।

'আয় রে, আমরা বাড়ি যাব। এই যে একে নিয়ে যেতে হবে।' নিনি চেঁচিয়ে ডাক দিল। শালপাতা তুলে খরগোশকে দেখিয়েও দিল। তবু কুকুর সেখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগল। খুব অস্থির। নিনি এগিয়ে গেল।

একটা পাখির বাসা ভেঙে পড়ে আছে। তার মধ্যে ছোট্ট একটা একলা শালিখ। ভয় পেয়ে উড়ে পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। ওর ডানা ভেঙে গেছে। শালপাতার মধ্যে খরগোশের সঙ্গেই আস্তে করে ওকেও তুলে নিল নিনি।

দুজনেই শান্ত লক্ষ্মী হয়ে রইল, একটুও ছটফট না করে। দু'হাতে কত সাবধানে ধরে আছে নিনি, নিশ্চয় বুঝেছে ওরা। কুকুরটাও কি ভালো, চুপটি করে সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল।

আজও পাহাড়ে যাওয়া হল না নিনির।

আরো কত পাখির বাসা ভেঙে পড়ে আছে কে জানে। কত পাখি, কত প্রাণী এমন অসহায় অবস্থায় আছে কে জানে। পুপলু প্রিয়া বুবুনরা সবাই মিলে যদি তাদের খুঁজে দেখত, কি ভালোই না হত!
কিন্তু বন্ধুরা কেউ রাজি হল না। বুবুন বলল, 'আমার মা এই সব নিয়ে ঢুকতেই দেবে না।'
পুপলু বলল, 'তুই নিয়ে গিয়েও কি ওদের বাঁচাতে পারবি? তার চেয়ে ওদের এখানেই ছেড়ে দে। ওদের এসব অভ্যেস আছে।'

পিঙ্কি বলল, 'ওদের নিয়ে যাচ্ছিস, ওদের মা এসে খুঁজবে না? ঠাকুর তখন তোকেই পাপ দেবে।'

বুম্বা তো আম কুড়োনো ফেলে এলই না। খেলা ছেড়ে কেউ নিনির সঙ্গে আসতেও চাইল না। কুকুরটা কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত সঙ্গে এল। নিনির সঙ্গে সঙ্গে মাকে ডাকাডাকিও করল। মা এসে ছোট্ট খরগোশ আর শালিখকে সাবধানে ঘরে নিয়ে গেল।

'এখন যাও ডাকু, কাল আবার এসো', কুকুরকে বলল নিনি।

'ওর নাম বুঝি ডাকু?' মা শুনতে পেয়েই বেরিয়ে এসেছে, 'দাঁড়া, ডাকুকে যেতে বলিস না। ওর খুব খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। ওকে খেতে দিই।'

মায়ের কথা শুনেই ডাকু জোরে জোরে ল্যাজ নাড়তে লাগল। এইজন্যে মাকে এত ভালো লাগে নিনির। মায়ের সব দিকে খেয়াল থাকে। খাবার সময় ডাকুকে ভালো করে সব বুঝিয়ে বলে দিল নিনি। সত্যি সত্যি খরগোশ আর শালিখের মায়েরা এসে খোঁজ করে যদি! ল্যাজ নেড়ে নেড়ে সব বুঝে নিল ডাকু।

তারপর কতদিন ধরে খরগোশ আর শালিখ থাকল নিনির বাড়ি। খরগোশের নাম হল জিনি আর শালিখের নাম চুনী। রোজ সকাল বিকেল আসতে লাগল ডাকুও। একদিন আর ফিরে গেল না। নিনির বাড়ি এখন ডাকুরও বাড়ি।

খুব মজা এখন।

ইচ্ছে করে বাবা সুর করে ডাকবে, 'নিনি নিনি নিনি ... কোথায় গেলি জিনি চুনী ...'

আর অমনি জিনি ছুটে আসবে। ওর পা সেরে গেছে, তবু আর জঙ্গলে যায় নি। চুনীর থাকার জন্যে একটা বেতের ঝুড়ি এনে দিয়েছে বাবা। বেতের ঝুরি উল্টে হাঁটি হাঁটি পায়ে ছুটে আসবে চুনীও। ও এখনও উড়তে পারে না।

ডাকু সেই সময় চুপটি করে বারান্দার কোনায় বসে থাকবে। ওর রাগ হয়েছে কিনা। বাবা কেন ওকে ডাকে নি! মা এসে তখন ডাকুকে কোলে নিয়ে আদর করবে। তবু ডাকু গম্ভীর হয়ে থাকবে। তখন বাবা বলবে, 'ডাকুবাবুর গোঁসা হয়েছে। কড়মড় করে একখানা টোস্ট করে দাও দেখি।' বাবার হাতে টোস্ট খেয়ে তবে ডাকুর মুখে হাসি ফুটবে।

বাবা বলেছে, 'নিনি রে, তোর চিড়িয়াখানার একটা নাম দিবি না?'

চিড়িয়াখানা কথাটা পছন্দ নয় নিনির। চিড়িয়াখানায় তো সবাইকে খাঁচার মধ্যে, লোহার জালের মধ্যে থাকতে হয়। এটা তো নিনির বাড়ি, চিড়িয়াখানা কেন হবে? বরং মা যে বলে, 'নিনির সংসার', সেই কথাটা খুব ভালো লাগে। আজকাল বাবাও 'নিনির সংসার' কথাটা বলছে।

বাড়িতে কেউ এলেই বাবা বলে, 'নিনি, তোমার সংসারের সবাইকে আলাপ করাও।'

জিনিকে দেখলেই সবাই কোলে নিয়ে আদর করে। একটুও দুষ্টুমি না করে শান্ত হয়ে বসে থাকে জিনি। ডাকুও তখন জিনিকে হিংসে না করে চুপ করে বসে থাকে। শুধু ছোট বাচ্চারা কাছে এলে ডাকু ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তখন নিনি চুপিচুপি বলে দেয়, 'বিহেভ ইওরসেলফ।' অমনি ডাকু আবার লক্ষ্মী ছেলে হয়ে বসে পড়ে।

চুনীকে দেখলেই সবাই বলে,'এই রে! এক শালিখ! জোড়াটা কই?' তাই চুনী লোকজনের সামনে যেতে চায় না। আজকাল রোজ সকালে একবার আকাশে উড়তে যায় চুনী। ঠিক সময়মতো ফিরেও আসে।

আসাম থেকে বেড়াতে এসে ছোটমাসি নিনির সংসারের আর একটা নাম দিয়েছে - 'হাসিকান্না চুনীপান্না।' এই নামটাও খুব পছন্দ হয়েছে নিনির।

আজকাল আর একা লাগে না নিনির। ঠিক করেছে, একদিন ডাকু চুনী আর জিনির সঙ্গে পাহাড়ে যাবে। ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সবুজ ছোলার ক্ষেত, হলুদ সরষের ক্ষেত। তারপর ঘন সবুজ বন। তারপর পাহাড়। মাথার ওপর মস্ত আকাশে সুজ্যিমামা এসে সোনার আলো ঢেলে দেয়। চূড়ার ওপর মেঘেরা এসে পা দুলিয়ে বসে গল্প করে। চুনীর মতো অনেক পাখি, ডাকুর মতো জিনির মতো অনেক প্রাণী। কাঠবেড়ালীদের সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়েরাও ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করে।

সে এক আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। পাহাড়ে উঠতে অনেক হাঁটা, অনেক কষ্ট, পায়ে ব্যথা। কিন্তু একবার উঠে পড়লে আর কষ্ট নেই। খোলা গলায় হাসো, আর অমনি পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সে হাসি ফিরে আসবে তোমার বুকের মধ্যে। সবাই মিলে ভালোবাসায় হাত ধরে অনেকদিন হাঁটলে সেই হাসিকান্না চুনীপান্নার দেশে পৌঁছনো যায়।

নিনি ঠিক করেছে, একদিন ডাকু চুনী আর জিনির সঙ্গেই পাহাড়ে যাবে।

আইভি চট্টোপাধ্যায়
জামশেদপুর,ঝাড়খন্ড

অলঙ্করনঃ
ঋতম ব্যানার্জি
কলকাতা

বিদেশী রূপকথা: ছোট্ট মেঘ

ছোট্ট মেঘ। আকাশে ভেসে বেড়ায়। এখনও তার বয়স হয়নি। সবে তো ক'টা দিন হল। সে জানে না কোথা থেকে এখানে এল। সে জানেনা কোথায় যেতে হবে। সবে তো ক'টা দিন হল। এরই মধ্যে সে দেখে চিনতে পেরেছে তার দাদা দিদিদের। তারাও তো তার মত আকাশে ভেসে বেড়ায়।

একদিন ওইরকম এক বড়ো মেঘ এল কাছে। শরীরটা ভারী ভারী। জলভরা মেঘ বলল, তুমি আমার ছোটো বোন। আমি তোমার বড় ভাই। এখন থেকে আকাশের পাড়ায় তুমি ঘুরে বেড়াবে। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

ছোটো মেঘ বলল, তোমার শরীরটা ভারী ভারী কেন?

বড়ো মেঘ বলল, আমার শরীর জুড়ে জলকণা। তুমি যখন বড়ো হবে আমার মতো, তোমার শরীরও জলকণায় ভরে যাবে। আমার মত তখন তুমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে।

এবার ছোটো মেঘ বলল, দেশে দেশে মানে কী?

বড়ো মেঘ বলল, তা-ও বুঝলে না? এই পৃথিবী জুড়ে কত শহর, গ্রাম, কত দেশ, কত মহাদেশ। কত মানুষ, কত ছেলে, কত মেয়ে। তারা সবাই যে যেখানে থাকে সেটাই তো তাদের দেশ।

ছোটো মেঘ অবাক হয়ে শোনে বড়ো মেঘদাদার গল্প।

ছোটো মেঘ বলে, তোমার খুব মজা তাই না? যখন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াও!

বড়ো মেঘ বলে, মজা তো হবেই। তবে তা কিছুদিনের জন্য। তারপরেই আমরা সবাই ফুরিয়ে যাই। হারিয়ে যাই। সময় যখন হবে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ব মাটিতে। তখন মরে যাব ঠিকই, তবে কী জানো, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে ভারী মজা! সে এখন তুমি বুঝবে না। তুমি যে এখনও অনেক ছোটো। বড়ো মেঘদাদা কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায়।ছোটো মেঘ এখনও জানেনা বৃষ্টি কাকে বলে। ঝরে পড়া মানে কী। তবু তার মনে হয় এখনই সব কিছু না জানলেও হবে।

আর একদিনের কথা। সেদিন ওর সামনে উড়ে এল হালকা সোনালি রঙের এক মেঘ। বলল, তুমি

আমার বোন। আমি তোমার দিদি।

ছোটো মেঘ তখন তাকে বলল, দিদি আমিও খুব খুশি তোমাকে পেয়ে। দিদি আমাকে বলো বৃষ্টি কী, ঝরে পড়া মানে কী।

মেঘ দিদি বলল, তুই আমি যখন বাতাস থেকে বেশি করে জলকণা খেয়ে ফেলি, তখনই আমাদের শরীরে জল ঢুকে যায়। জলভরা হলেই একসময় পৃথিবীতে ঝরে পড়ি। তখন তাকে বৃষ্টি বলে, বুঝলি? ছোটো মেঘ শোনে মেঘদিদির কথা।

মেঘদিদি আরও বলে, তোর খুব সুন্দর শরীর। বাতাস থেকে বেশি বেশি জল কখনোই খেয়ে নিবি না, তাহলে বৃষ্টি হয়েও ঝরবি না। অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারবি তাহলে। ঝলমল শরীরে আকাশে উড়ে বেড়াবি, তোকে কি সুন্দর লাগবে দেখতে। পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে তোকে দেখবে।

মেঘদাদা, মেঘদিদির কথা শুনে ছোটো মেঘ বড়ো হয়ে ওঠে। তবু এখনও সে অনেক কিছু বুঝে উঠতে পারে না। সে খোঁজে তার মা-কে তার বাবাকে। এত খুঁজে বেড়ায় তবু পায় না। মনে দুঃখ হয়। দুঃখ হবেই বা না কেন? বাবা-মার আদর এখনও যে তার জোটেনি!

ছোটো মেঘ এখন আর ছোটো নেই। সে-ও দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে গেছে।

একদিন উড়তে উড়তে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গেল এক গরমের দেশে। সে চেয়ে দেখল তার মেঘদিদি আর মেঘবোনেরাও বেশ ভেসে বেড়াচ্ছে।গরমদেশে ভেসে বেড়াতে তাদের যে খুব ভালো লাগে। ভাসতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে ছোট মেঘের চোখ গেল মাটির পৃথিবীতে। দেখল কত মানুষ! আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা নাকি বৃষ্টি চায়। যা মেঘেরাই দিতে পারে।

এক মেঘদিদি কাছে এসে বলল, একফোঁটা বৃষ্টির জন্য মানুষ প্রার্থনা জানাচ্ছে। ছোটো মেঘ-বোন ওসবে কান দিস না। বৃষ্টি হয়ে একবার ঝরে পড়লে আর তোকে আমরা পাব না। তখনই তুই হারিয়ে যাবি, ফুরিয়ে যাবি।

ছোট মেঘ কী করবে ভেবে পায় না। গরমদেশে এসে অবধি তার মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তার চোখে পড়ছে ফুটি-ফাটা মাটি।

কত পুকুর দেখেছে সে, এক ফোঁটা জল নেই সেখানে। জল না পেয়ে মাঠের ফসল শুকিয়ে গেছে, মানুষের কান্নাও শুনেছে সে, হা জল! হা জল! এমনকি গানও শুনেছে সে, আল্লা মেঘ দে, পানি দে। এমনকি চাতকপাখির কান্নাও তার মনকে খুব কষ্ট দিয়েছে। ওদিকে মেঘদিদির সাবধান বাণীও কানে বাজছে তার।- বৃষ্টি হয়ে ঝরিস না, তা হলেই তুই হারিয়ে যাবি, ফুরিয়ে যাবি।

এবার ছোটো মেঘের মনে হল সে সত্যিই হারিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে। যদি কোন ভালো কাজে সে আসে, তবে এ জীবন তার সার্থক হবে।

ছোটো মেঘের মনে হল, আমার কাছে যতটুকু জল আছে তা দিয়েই সেবা করব আমি।

এ কথা ভাবা মাত্রই ছোটো মেঘ তার ছোট্ট জলভরা শরীর নিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। নামছে তো নামছেই। একসময় সে-ও বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল মানুষের কাছে।

শেষবারের মতো ছোটো মেঘের মনে পড়ল বড়ো মেঘদাদার কথা-সময় যখন হবে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ব মাটিতে। তখন মরে যাব ঠিকই, তবে কী জানো, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে ভারী মজা!
আজ সে অনুভব করল সত্যিই কী মজা!চেয়ে দেখল ওকে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে দেখে, পৃথিবীর কচিকাঁচার দল কেমন আনন্দে নেচে উঠেছে! সকলের মুখেই খুশি-হাসি। ওদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বড়োরাও কেমন লাফালাফি করছে! যা সে এর আগে কোনোদিন দেখেনি।

সুনির্মল চক্রবর্তী
জাতীয় পুরষ্কারপ্রাপ্ত শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী ইচ্ছামতীকে উপহার দিয়েছেন এই রাশিয়ার রূপকথাটি। এই গল্পটি পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে।

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃপর্ব ৭

লিখতে বসেছি ত গ্রীষ্মসংখ্যার জন্য, অথচ শীত বসন্তের সব কথা ত' বলাই হয়নি। তেমন কথাই কিছু কিছু বলি প্রথমে।

পুজোর ছুটির পরপরই বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা আগেই বলেছি। তবে পরীক্ষার সবটাই ভয়ের ছিল না আমার কাছে। পরীক্ষার পর নতুন শ্রেনীতে উঠে নতুন বই হাতে পাওয়ার আনন্দও থাকত মনের মাঝে। নতুন বই হাতে পেতে খুব আনন্দ হয় না? আমার ত হত।

এখনকার মত তখন ডট পেন নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ভাবাই যেত না, কেননা ঐ পেন তখন ছিলই না। সে সময় আমাদের দোয়াত কলম নিয়ে যেতে হত পরীক্ষার সময়। বিশেষ কায়দায় তৈরী একরকম দোয়াত পাওয়া যেত যাতে অল্প কালি রাখলে উলটে গেলেও দোয়াত থেকে কালি পড়ে যেত না। আর ছিল কাঠের কলম যার মাথায় থাকত ধাতব নিব।

বন্ধুরা একটা কচুর ডাঁটা নিয়ে তাতে কলমের নিবটা খচ খচ করে বারে বারে বেঁধাত। এতে নাকি কলম দ্রুত চলে। ওদের দেখাদেখি আমিও করতাম বটে তবে তেমন কিছুই বুঝিনি।

পরীক্ষা হয়ে গেলে আসত মজা করার দিন। একে শীতকাল তায় লম্বা ছুটি, মজা হবে কিনা তোমরাই বল। এরপর একসময় আসত ফল প্রকাশের দিন। কি কি পরীক্ষা হত বা কত নম্বর পেতাম সেসব এতদিন পরে মনে নেই। তবে নম্বর লেখা কাগজটার সাথে থাকত কতকগুলো নতুন নতুন বই। বড়মাস্টারমশাই দিতেন নতুন শ্রেণীর পাঠ্য হিসেবে। কি দারুন ব্যাপার বল ত!

বিশেষকরে বাংলা বইটা যে কি ভাল লাগত তা বলার নয়।কেন বল দেখি?নতুন নতুন গল্প কবিতা থাকত বইটা ভর্তি। একদিনের মধ্যেই সব পড়া হয়ে যেত সেসব। তবে কবিতা গুলো মুখস্থ হতে চাইত

না সহজে। বার বার পড়ে পড়ে যখন কন্ঠস্থ হয়ে যেত সে সব আর সহজে ভুল হত না।

সেই সব কবিতার কিছু কিছু শুনবে? অল্প সল্প মনে আছে এখনও, যেমন
'এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে নামটি তাহার ননে,
পাখির ছানা পাড়তে সদা ঘুরত বনে বনে।
একদিন সে উঠল গাছে পাড়তে ঘুঘুর ছানা,
শাবক নিয়ে নামছিল সে বলে তাধিন তানা।
এমন সময় দেখল সে এক কেউটে ভয়ংকর,---'
এর পর আরও অনেকটা, বেশ বড় কবিতা। এছাড়া ছিল, 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকেবাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে' বা 'মৌমাছি মৌমাছি, কোথা যাও নাচিনাচি-'।আরও কত কি!

পৌষপার্বনটা যে কি সেটা আর বলে দিতে হবে না বোধ হয়। এটা যে পিঠে খাবার উতসব সেটা সবাই জানে। পৌষ মাসের শেষ তারিখে বা সংক্রান্তিতে হয়। সেই জন্য পৌষসংক্রান্তিও বলে একে।

নানা রকম পিঠে পুলি আর পায়েস খাবার দিন এটা। চালের গুঁড়ো, দুধ, নারকেল,ডাল-- এসব দিয়ে তৈরী হত নানা রকমের সুখাদ্য। শহরের মত এসব জিনিষ বাজার থেকে কেনা হত না।

চাল গুঁড়ো করা হত ঢেঁকিতে। দিয়ানি, মামিমা মাসিমারা করতেন। সবার বাড়িতে ঢেঁকি ছিল না, তাই অন্যান্য বাড়ির মহিলারাও আসতেন চাল গুঁড়োতে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সাহায্য করতেন। ঢেঁকি দেখেছ? না দেখে থাকলে দেখার জন্য গ্রামে যেতে হবে। দেখে এস, মজা পাবে।

বাড়ির গরু দুইয়ে দুধ পাওয়া যেত। বেশী দরকার হলে বাজার থেকে কেনা হত। একবার মনে আছে-- এক কলসী দুধ বড়মামা ১৪ পয়সায় অর্থাৎ সাড়ে তিন আনায় কিনেছিলেন। তাতে দাদুর কাছে খুব বকুনি খেয়েছিলেন ঠকে আসার জন্য। দাদুর ধারনা ছিল ঐ দুধ অন্ততঃ দশ বা বার পয়সায় পাওয়া যেত। গাছে উঠতে ওস্তাদ সোনামামা আর ফুলমামা গাছে উঠতেন নারকেল পাড়ার জন্য।

আর একটা কাজ হত, বেশ মজার। পৌষপার্বনের আগের দিন সকালে দিয়ানি লোক লাগিয়ে সারা উঠোন ঝাঁট দিয়ে গোবরজল দিয়ে লেপেপুঁছে তকতকে করে রাখতেন। সংক্রান্তির দিন সকালে দাদু সেই উঠোনে কাঠ কয়লা দিয়ে হাতি ঘোড়া,গরু- এসব জন্তু জানোয়ারের ছবি এঁকে দিতেন। এর ওপর চালগুঁড়ো জলে গুলে রং-এর মত তৈরী করে বুলিয়ে দেওয়া হত। হয়ে যেত আলপনার জীবজন্তু। জ্যোতস্না রাতে সে সব দারুন সুন্দর দেখাত। যে জন্য এত সব করা,সেটা হত সবার শেষে। অর্থাৎ পেট পুরে পিঠে খাওয়া।

পরীক্ষা, পৌষপার্বন-- এসব যেতে যেতেই এসে পড়ত সরস্বতীপূজো। এ সম্পর্কে আগে বলেছি, মনে আছে তো? তখন অবশ্য একটা কথা বলা হয়নি। একবার ছোটমামারা ঐ সময় নাটক করেছিলেন। এখন নাটকে কত রকমের সেট ইত্যাদি তৈরী হয়। তখন গ্রামে ওসব আর কোথায় পাওয়া যাবে! মঞ্চের পেছন দিকে কয়েক রকমের ছবি আঁকা স্ক্রীন গোটান অবস্থায় থাকত। নাটকের প্রয়োজন মত সেই পর্দাগুলো দেখাবার ব্যবস্থা করা হত, যেমন, শহর বোঝাবার জন্য শহরের ছবিওয়ালা পর্দা, গ্রাম বোঝাতে সেখানকার ছবি-এই রকম আর কি। নাটকের সময় গ্রীনরুমে উঁকি মারতে গিয়ে বড়দের

ধমক আর ছোটমামার কানমলা খেতে হয়েছিল।

ফুলমামাদের দল একবার একটা নাটক করেছিলেন, যার নাম ছিল 'টিপু সুলতান', আর এতে ফুলমামা সেজেছিলেন একজন সাহেব। তাঁর চেহারা ছিল দেখবার মত। দারুন মানিয়েছিল সাহেবের বেশে।

সরস্বতী পুজো কাটতে না কাটতেই চারিদিকের আবহাওয়া কেমন যেন বদলে যেত। এই সময় আমের মুকুল, কাঁঠালের মুচি, লেবু আর সজনে ফুলের গন্ধে চারিদিক ম' ম' করত। কি সুন্দর যে লাগত!

সাধারনত পুর্ববাংলায় পলাশফুল দেখা যায় না। লালমাটির দেশের গাছ ও দেশে হতে চায় না। কিন্তু কি করে জানি একটা পলাশ গাছ মামাদের বাগানে হয়ে গেছিল আর সেটা ছিলও বেশ উঁচু, অন্য সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে গেছিল সেটা। অনেক দূর থেকে দেখা যেত।

পাবনার বাড়ি থেকে যখন মামার বাড়ি আসতাম তখন অনেকটা পথ গরুর গাড়ীতে আসতে হত। ঐ সময় লক্ষ্য রাখতাম পলাশ গাছটার দিকে। অনেক দূর থেকে সেটা দেখতে পেলেই মনটা নেচে উঠত মামার বাড়ি আর দিয়ানির আদরের কথা ভেবে।

ভাল কথা, গরুর গাড়ি চড়েছ কখনো? মোটেই ভাল লাগত না চাপতে। কিন্তু কি আর করা যাবে বল, তখন ত' এখনকার মত নানা ধরনের যানবাহন ছিল না। অনেকদিন আগেকার কথা কিনা! তাই ভাল না লাগলেও চাপতেই হত। নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা পাবার জন্য সুযোগ পেলে একবার চেপে দেখতে পার। মজা পেতেও পার।

পলাশ গাছের কথা বলছিলাম। মাঘমাসে সরস্বতী পুজোর সময়েই শুরু হত ফুল ফোটা। গাছে থাকত আরও একদেড় মাস। পলাশফুলের মধু খেতে সমস্ত দিনই পাখীরা কিচির মিচির করত। রাতে বাদুর বা অন্য কোন রাতজাগা পাখী আসত। তাই সকালে গাছের তলায় অনেক ফুল পড়ে থাকত। মাঘের হাড়কাঁপানো শীতের সকালে সেই ফুল কুড়োতাম।

বসন্ত কালের একটা বড় উতসব হল চড়কপুজো আর মেলা। সেটা ত' এখানেও হয়। তোমরা মেলায় যাও ত?

চৈত্রমাসে পুজো হত পাটঠাকুরের। সেটা কি তা বলি। গোটা মাস ধরে প্রতি পাড়ার দু'একটা দল, যে দলে ৮/১০ জন করে থাকত, প্রতিদিন একটা ঠাকুর কাঁধে নিয়ে বাড়ী বাড়ী চালডাল ভিক্ষে করে বেড়াত। পাটঠাকুর কেমন দেখতে বলি সেটা। নৌকর মত দেখতে, কাঠের তৈরী, কালো রং করা জবজবে করে তেলসিঁদুর মাখানো আর সংগে একটা বড় ত্রিশূল - এই হল ঠাকুর। একে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হত।

এক মাস ধরে ভিক্ষে করলে অনেকটা চালই হওয়ার কথা,হতও তাই। সেই চালডালের খিচুড়ি রান্না করে সংক্রান্তির দিন হৈ চৈ করে খাওয়া হত। বড়রা প্রতি বছর করলেও আমি করতে পেরেছিলাম একবছর, যখন একটু বড় হয়েছি।

যাই হোক, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে চড়কের মেলা বসত গ্রামে। তাতে যে কত রকমের জিনিষ বিক্রি হত! আমাদের মত ছোটদের একটা জিনিষ অতি অবশ্যই কিনতে হত মেলা থেকে। অবিকল হাতদা'এর মত দেখতে একখানা ছোট্ট ছুরি। হাতদা, যাকে কাটারিও বলে, দেখেছ ত? তাতে হাতল থাকত না, লাগাতে হত কেনার পর। এ ব্যাপারে হরিশদা ছিল যাকে বলে এক্সপার্ট।

কেন কিনতাম বলত ছুরিখানা? আরে,কাঁচা আম খেতে হবে না! ইতিমধ্যেই যে আমের গুটিগুলো বেশ বড় বড় হয়ে যেত।

আমের গুটি গাছ থেকে পারবার নানা রকম ফিকির ছিল। একত' ঢিল ছুঁড়ে পারা যেতই, এছাড়াও লাঠির সাথে বিশেষ ভাবে একটুকরো কাঠ বেধেঁ একটা কোঁটা বানিয়ে তাই দিয়ে বা গাছে উঠে পারা যেত। কিন্তু এছাড়াও আরও একটা উপায় ছিল।

বেত গাছ দেখেছ? যে বেত দিয়ে আসবাবপত্র বানানো হয়, সেই গাছ। এটা একটা লতানো গাছ,গা ভর্তি কাঁটা। এই লতার একেবারে মাথায় থাকত একটা লম্বা শিষ, যাতে থাকত খুব ধারালো অজস্র কাঁটা। একটা লম্বা লাঠির মাথায় এই শিষ বেঁধে নিলেই হয়ে যেত আম পারবার কোঁটা। ব্যস, তারপর যে আমটা চাই, তার বোঁটায় আটকিয়ে টান মারলেই আম একবারে হাতের মুঠোয়।

আম পেড়ে ছোট ছুরিখানা দিয়ে খোসা ছাড়ানো এরপর সহজ ব্যাপার। তারপর নুন দিয়ে আয়েস করে কাঁচা আম খাওয়া! লোভে পড়ে বেশ কয়েকটা খেয়ে ফেলতাম, ফলটা বুঝতেই পারছ। দাঁত টকে একেবারে যাচ্ছেতাই। আর উপরি পাওনা ছিল বড়দের বকুনি।

চৈত্র বৈশাখ মাসে হরিশদা আর অন্য কাজের মানুষেরা একটানা রোদের মধ্যে কাজ করে ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে যেত। দুপুরে ফিরে এসে সবচেয়ে টক আমগাছের আম পেড়ে নিড়ানি (খুরপি) দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে আমগাছের ছায়ায় বসে নুন দিয়ে কাঁচা আম খেত। এতে নাকি গরম লেগে অসুখ করে না।

ওরা যে আমগাছের আম খেত, সেটা ছিল সবচেয়ে টক আমের গাছ। গাছটার নাম কি ছিল জান! চুকারি! কেন বল দেখি। পুর্ববাংলার মানুষ টককে বলেন 'চুকা', তাই চুকারি। পাকলেও ঐ আম মিস্টি হত না। সে জন্য কাঁচা খেয়েই শেষ করা হত।

বেত গাছের কথা যখন উঠল তখন আর একটা কথা বলি। এই গাছে ছোট ছোট থোকা থোকা ফল হয়, এক এক থোকায় আঙ্গুরের মত অনেকগুলো করে ফল থাকে। ফল পেকে গেলে খোসা ছাড়িয়ে

নিলে ভেতরে লাল শাঁস পাওয়া যায়। টক টক, ভালই লাগে খেতে। এর নাম হল 'বেথুর'।

আর একটা ফলের নাম বলি। এর নাম হল 'গাব'। মাঝারি আকারের গাছ হয়, আর সবুজ সবুজ টোম্যাটোর সাইজের ফল হয়। কাঁচা অবস্থায় এই ফলের দারুন আঠাল কষ বেরোয়। খোসার ওপর ছুরির একটা পোঁচ মারলেই হল। গল গল করে আঠা বেরতে থাকে। ঘুড়ি ওড়াবার সময় একটা গাব সঙ্গে থাকা চাইই চাই, ঘুড়ি ছিঁড়ে গেলে আঠা দিয়ে জুড়তে হবে ত'!

সে সময় এখনকার মত নাইলনের জাল পাওয়া যেত না। তাই মাছ ধরার জন্য সুতোর জাল ব্যবহার করতেন জেলেভাইরা। কিন্তু জলে থেকে থেকে জালের সুতো পচে যেত। যাতে সেটা না হয় সে জন্য গাব ব্যবহার করা হত। কি করে? কাঁচা গাব খন্ড খন্ড করে কেটে নিয়ে জলে ফোটানো হত আর ওই ফুটন্ত জলে সুতোর জাল ডুবিয়ে রাখা হত। এরপর শুকিয়ে নিলে সুতোর ওপর গাবের আঠার একটা আস্তরন পড়ে যেত, যা জালকে পচন থেকে রক্ষা করত। আর গাব পেকে গেলে সেটা যা একটা সুস্বাদু ফল হত তা আর কি বলব!পাকা গাবের বিচি মুখ থেকে ফেলতেই ইচ্ছে হত না। বেথুর আর গাব ঠিক কখন পাকত সেটা এতদিন পর মনে নেই।

দেখ, চড়কের মেলা থেকে কত কথা এসে গেল। মেলার আরও অনেক কথাই যে বাকি থেকে গেল। যাত্রা দেখার কথা, জিলিপি আর নানা রকম ভাজা খাবার কথা-- এসব কথা খুব মনে পড়ে। একধরনের ঝুড়িভাজার,জিলিপির মত প্যাঁচালো, কথা বেশ মনে আছে। আর মনে আছে রঙ বেরঙের মঠের কথা। চিনি দিয়ে তৈরী মঠ খেতে খেতে গা গুলিয়ে উঠত।

যাত্রার রাজাদের সাজপোষাক দেখে ঐ রকম সাজার চেষ্টা করতাম, ঠিক অপুর মত (পথের পাঁচালি দেখেছ ত?)। তা দেখে দাদু একটা ধনুক বানিয়ে দিয়েছিলেন।

মাঘ ফাল্গুন মাসে ফাঁকা মাঠের দিকে চাইলে হঠাত কোন খেত নজরেপড়ত যেটা হলুদ ফুলে ভরা। সেটা আসলে সরষে ক্ষেত আর ওগুলো সরষে ফুল। সুন্দর সে দৃশ্য ভলা যায় না।

চৈত্র মাসে শীত পড়ে, এটা বিশ্বাস করতে পার! অবাক লাগলেও মোটেই আশ্চর্য্য নয়। মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হয় চৈত্র মাসে।হলে সেদিন পড়ত যাকে বলে হাড়কাঁপানো শীত। মুশকিল আসান ত ছিলই হাতের কাছে। দিয়ানির তৈরী কাঁথার কথা বলেছিলাম মনে নেই? তা থাকতে আর চিন্তার কি!তার একখানা জড়িয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে নাক ডাকাতাম।

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

<u>মনের মানুষ: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী</u>

'গুপি গাইন বাঘা বাইন' – এই ছবিটা তো তুমি দেখেছ; ছবিটা কে বানিয়েছেন তাও জানো; কিন্তু এই গল্পটা কার লেখা সেটা জানো কি? –তুমি জানো? বাঃ! খুব ভালো। কিন্তু যারা জানেনা, তাদের উত্তরটা জানিয়েই দিই, কি বলো? – গুপি গাইন বাঘা বাইন গল্পটা লিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি; তিনি সুকুমার রায়ের বাবা, সত্যজিত রায়ের দাদু। শুধুই কি এই? মোটেও নয়। আরো অনেক কিছু বলার আছে তাঁর বিষয়ে...আমাদের এই সংখ্যার মনের মানুষ যে তিনি।

১৮৬৩ সালের ১০ই মে, এখনকার বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাবা শ্যামসুন্দর ছেলের নাম রেখেছিলেন কামদারঞ্জন। সেই ছেলেকে কিছুদিনের মধ্যেই দত্তক নেন শ্যামসুন্দরের ভাই হরিকিশোর। তিনি ছেলের নাম বদলে রাখেন উপেন্দ্রকিশোর।

ময়মনসিংহে স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় থেকেই তিনি ছোটদের জন্য যে সব পত্রিকা গুলি প্রকাশ হত – যেমন 'সখা', 'সাথী', 'মুকুল', 'বালক', সেগুলিতে নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। এই লেখাগুলি ছিল বেশিরভাগই জীব-বিজ্ঞান বিষয়ক। তারপরে তিনি গল্প লিখতেও শুরু করেন। আর বেশিরভাগ লেখাগুলির সঙ্গে তিনি খুব সুন্দর ছবি এঁকে দিতেন।

কিন্তু সেই সময়ে আমাদের দেশে ছাপাখানার ব্যবস্থা খুব ভালো ছিলনা। কাঠের ব্লক দিয়ে ছবি ছাপা হত, সেগুলি দেখতে মোটেও ভালো হত না। কিন্তু ছোটদের বই যদি ঝকঝকে সুন্দর, রঙে ভরা না হয়, তাহলে কি আর তারা সেগুলিকে পছন্দ করবে?

ছোটদের জন্য সুন্দর ছবি সহ, রঙচঙে বই কিভাবে ছাপানো যায়, সেই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করলেন উপেন্দ্রকিশোর। নিজের খরচায় বিদেশ থেকে তিনি নানাধরনের বই ও যন্ত্রপাতি আনালেন, আর বাড়ীতে বসে নানারকমের পরীক্ষা -নিরিক্ষা করলেন। সেই সময়ে যোগীন্দ্রনাথ

সরকারের 'সিটি বুক সোসাইটি' থেকে, উপেন্দ্রকিশোরের লেখা প্রথম বই –'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশিত হল। সেই বইতে তিনি অনেক ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু যেহেতু ছাপার ব্যবস্থা ভাল ছিলনা, তাই ছবিগুলি ভালো করে ছাপা হল না। এই ঘটনার পরেই উপেন্দ্রকিশোর বিদেশ থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনিয়ে, নিজের বাড়িতেই প্রেস খুলে বসলেন ১৮৯৫ সালে। সেই প্রেসের নাম হল ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স; ঠিকানা ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীট।

এইবার উপেন্দ্রকিশোর মনের মত করে ছোটদের জন্য বই ছাপতে শুরু করলেন। সাথে সাথে চলতে থাকলো ছোটদের জন্য নানান ধরনের বই লেখা, ছবি আঁকা, ছোটদের জন্য নাটক লেখা, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে কাজ করা, গান লেখা। আর চলতে থাকলো মুদ্রনশিল্পের উন্নতির জন্য আরো পড়াশোনা। হাফ-টোণ পদ্ধতিতে ব্লক-প্রিন্টিং নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন তিনি। তাঁর সমস্ত গবেষণা ও হাতে -কলমে কাজের ফলাফল নিয়ে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে পাঠাতেন ব্রিটেনের পেনরোজ অ্যানুয়াল পত্রিকায়। তাঁর উদ্ভাবন করা নিয়মটি পরবর্তীকালে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হত। 'ছেলেদের রামায়ণ' এর পরে তিনি একইরকম সহজ সরল ভাষায় লিখলেন 'ছেলেদের মহাভারত'। লিখলেন গ্রহ-নক্ষত্র-পশু-পাখি-ইতিহাস-ভূগোল-আবিষ্কার-ভ্রমণ-কাহিনী-এইরকম নানান বিষয় নিয়ে 'সেকালের কথা'। লিখলেন মহাভারতের গল্প, পৌরাণিক কাহিনী। আরো লিখলেন বাংলার লোককথা-উপকথার ভান্ডার থেকে নানা ধরনের গল্প সংগ্রহ করে 'টুনটুনির বই'। লিখলেন দেশ-বিদেশের নানারকম মজাদার গল্প। উপেন্দ্রকিশোরের যাবতীয় লেখা পরে একসঙ্গে করে প্রকাশ করা হয়েছে বহুবার 'উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী' নাম দিয়ে। এসব ছাড়াও আমাদের তিনি উপহার দিলেন আরেকটি অসাধারন জিনিষ - 'সন্দেশ' নামের এক সুন্দর, ঝকঝকে, রঙিন মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ বাংলা ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে। সেই সময়ের সমস্ত বিখ্যাত লেখক ও গুনীজনেরা এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। উপেন্দ্রকিশোরের ছয় ছেলেমেয়েও লিখতেন এই পত্রিকায়। এই পত্রিকা বহুবছর সফল ভাবে চলার পর বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে যায়। অনেকদিন পরে, উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র সত্যজিত আবার এই পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্ব হাতে তুলে নেন। এই পত্রিকা এখনও কলকাতা থেকে নিয়মিত প্রকাশ করেন শ্রী অমিতানন্দ দাশ।

১৯১৫ সালে বাহান্ন বছর বয়সে ডায়াবিটিস রোগের শিকার হয়ে প্রয়াত হন আমাদের এই মনের মানুষ। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের বন্ধু। আনন্দ-আমোদের মধ্যে দিয়েই যে ছোটদের পড়াশোনা শেখানো উচিত, সেই বিষয়ে এঁরা ছিলেন একমত। ছোটরা যেন স্কুলের বাঁধাধরা পড়াশোনার বাইরে অন্যান্য জ্ঞান লাভ করে, সেইদিকে সদাই তাঁর নজর ছিল। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যের জনক। ছোটদের ভালোবেসে, ছোটদের জন্য ভাবনাচিন্তা করে আজীবন কাজ করে গেছেন। যিনি আমাদের এত ভালবেসে এত উপহার দিয়ে গেছেন, তাঁকে ভাল না বেসে কি পারা যায়?

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী, কলকাতা

পড়ে পাওয়া: টুনটুনি আর বিড়ালের কথা

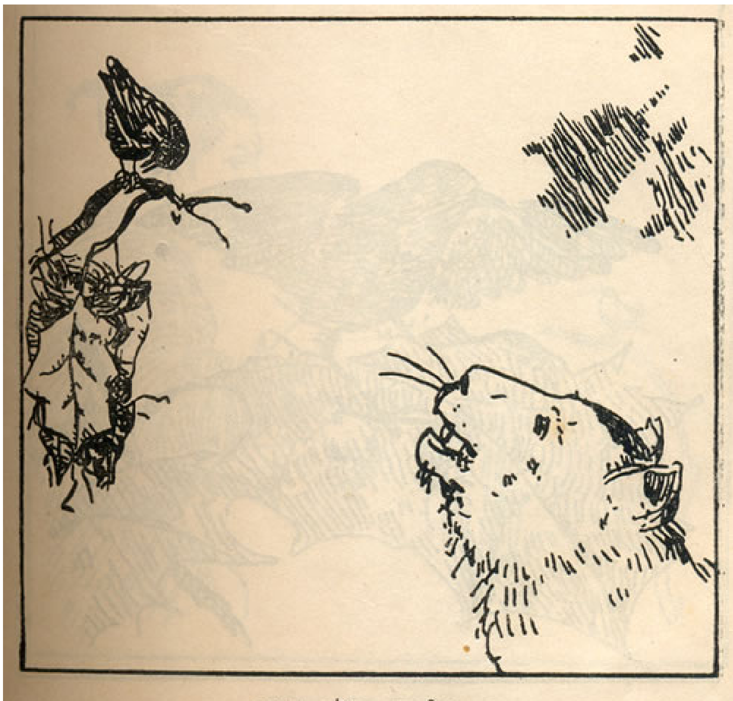

'প্রণাম হই মহারানী!'

গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে। সেই বেগুন গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি পাখিটি তার বাসা বেঁধেছে।

বাসার ভিতরে তিনটি ছোট্ট-ছোট্ট ছানা হয়েছে। খুব ছোট্ট ছানা, তারা উড়তে পারে না, চোখও মেলতে পারে না। খালি হাঁ করে আরে চীঁ-চীঁ করে।

গৃহস্থের বিড়ালটা ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে 'টুনটুনির ছানা খাব।'

একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, 'কি করছিস লা টুনটুনি?'

টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রণাম হই, মহারানী!'

তাতে বিড়ালনী ভারি খুশি হয়ে চলে গেল।

এমনি সে রোজ আসে, রোজ টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর মহারানী বলে, আর সে খুশি হয়ে চলে যায়।

এখন টুনটুনির ছানাগুলি বড় হয়েছে, তাদের সুন্দর পাখা হয়েছে। তারা আর চোখ বুজে থাকেনা। তা দেখে টুনটুনি তাদের বললে, 'বাছা, তোরা উড়তে পারবি?'

ছানারা বললে, 'হ্যাঁ মা, পারব।'

টুনটুনি বললে, 'তবে দেখ তো দেখি, ঐ তাল গাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কি না।'

টুনটুনি বেগুন গাছে নাচছে

ছানারা তখনই উড়ে গিয়ে তাল গাছের ডালে বসল। তা দেখে টুনটুনি হেসে বললে, 'এখন দুষ্ট বিড়াল আসুক দেখি!'

খানিক বাদেই বিড়াল এসে বললে, 'কি করছিস লা টুনটুনি?'

তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দেখিয়ে বললে, 'দূর হ, লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী!' বলেই সে ফুরুক করে উড়ে পালাল।

'দূর হ, লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী

দুষ্টু বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে, টুনটুনিকেও ধরতে পারল না, ছানাও খেতে পেল না। থালি বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল।

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী
সাহিত্যম
১২৫ টাকা

এই পাতার ছবিগুলি স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি'র আঁকা।

দেশে-বিদেশে

জয়পুর-গোলাপী শহর

জয়পুর -গোলাপী শহর

জয়পুর থেকে ফিরছি ইতিহাসের ঘ্রাণ নিয়ে আর মনের মাঝে জেগে আছে গোলাপী শহর, যেখানে কথা বলে ওঠে প্রতিটি প্রাসাদ,দুর্গ,পাথর,চিত্রকলা।

কি বলে জানো? বলে বহুদিন আগের নানা গল্প; তখন আমাদের পৃথিবীটা অন্যরকম ছিল, দেশটাও। দিল্লী থেকে ট্রেনে জয়পুর যেতে সময় লাগে পাঁচ ঘন্টা।সকাল ছটায় রওনা হয়ে সকাল এগারোটায় পৌঁছে গেলাম জয়পুর,রাজস্থানের রাজধানী যাকে 'পিঙ্ক সিটি' বা 'গোলাপী শহর' বলা হয়।

গোলাপী শহর

এই শহর টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজ সওয়াই জয়সিং।'সওয়াই' শব্দের অর্থ এক এবং এক চতুর্থাংশ। যিনি সাধারণের থেকে সব দিক দিয়ে এক চতুর্থাংশ বেশি এমন প্রতিভাসম্পন্ন রাজাই পেতেন 'সওয়াই' উপাধি।

মহারাজ সওয়াই জয়সিং

অনেক কিছু দ্রষ্টব্য জয়পুরে; আমরা শুরু করলাম 'অ্যালবার্ট হল্ মিউজিয়াম' দিয়ে।

রামনিবাস বাগ

মিউজিয়াম টি রামনিবাস বাগে অবস্থিত।যেটি নির্মিত হয়েছিল সওয়াই দ্বিতীয় রামসিং দ্বারা।সুইনটন

জেকব নামে প্রযুক্তিবিদ এটিকে রূপদান করেন।১৮৮৭ সালে এটি সাধারণের জন্য খোলা হয়।মিউজিয়াম টির স্থাপত্যশৈলী সুন্দর।এখানে রাজাদের ব্যবহৃত বহু দ্রব্যসামগ্রী সযত্নে রাখা আছে।

বিভিন্ন রকম অস্ত্রশস্ত্র,তীর ধনুক,ছুরি,বন্দুক

নানারকম বাদ্যযন্ত্র রাজকীয় পোশাক পরিচ্ছদ,অনেক পুঁথিপত্র,রাজস্থানী চিত্রকলা।

এর থেকে বোঝা যায় রাজারা গান ও ছবি খুব ভালবাসতেন।একটি ইজিপশিয়ান মমির ও দেখা মিলল এখানে।চৈনিক বৌদ্ধ ও রামায়ন মহাভারতের নানা গল্প এখানে রাখা চিত্র ও মূর্তিগুলিতে ধরা পড়ে।

চৈনিক বৌদ্ধ চিত্রকলা

আছে রামায়ন মহাভারত ও হিতোপদেশের বাণী।

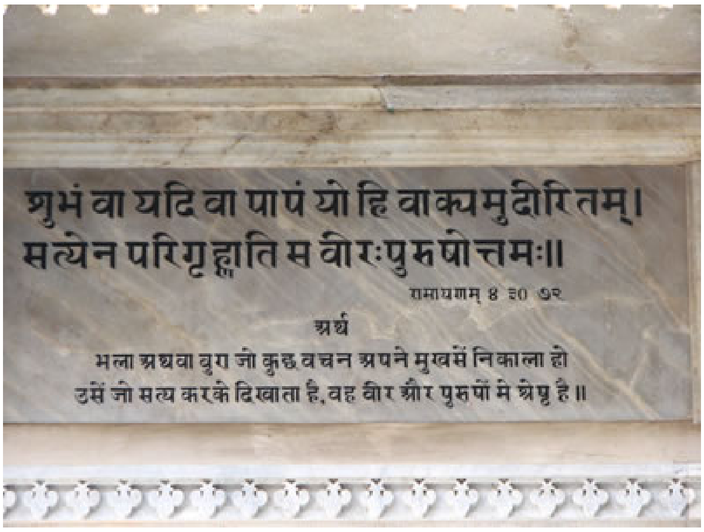

রামায়ণের বাণী

আমার সবচেয়ে মজা হয়েছে প্রচুর পায়রা দেখে।

পায়রা

গাছের এডালে ওডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল দুষ্টু কাঠবেড়ালী, যেন পুটুস পাটুস চোখে আমাদের ওখানেই থেকে যাওয়ার অনুরোধ করছিল।তবে আমাদের যে যেতে হবে আর এক অভিযানে।এবার গন্তব্য অম্বর দূর্গ(স্থানীয় ভাষায় আমের)।

আধ ঘন্টায় পৌঁছে গেলাম সেখানে।এটি একটি গিরিদুর্গ।ঘুরে ঘুরে পথ গেছে সেখানে।খুব উত্তেজনা আর আনন্দ হচ্ছিল মনে,যেন বইয়ে পড়া কোনো রূপকথার গল্প আস্তে আস্তে জীবন্ত হয়ে উঠছে আর এইমাত্র ধরা দেবে চোখের সামনে।আর হলও তাই!

অম্বর দূর্গ

সত্যিই অবিশ্বাস্য এই দুর্গ!আর রাজাদের এই কীর্তি।

আমার নতমস্তক হয়ে শত শত বার প্রনাম জানাতে ইচ্ছে করছিল ঐ রাজাদের,আর নিজেকে সত্যিই ধন্য মনে হচ্ছিল এই ভারতের এই পুণ্য ভুমিতে আমার জন্ম এই ভেবে।

দুর্গ থেকে নিচের দৃশ্য অভাবনীয় সুন্দর।

কত যুদ্ধ, বিগ্রহ,রাজ্যপাট আর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে এই দূর্গগুলি।সেই কীর্তিমান রাজারা আজ নেই,কিন্তু এখানে প্রতিটা ইঁটপাথরে কান পাতলে শোনা যাবে তরোয়ালের ঝনঝনা,ঘোড়া ও হাতিদের সগর্ব আস্ফালন্।তাই তো বললাম,এখানে ইতিহাস কথা বলে।

দুর্গের মাথায় বসেছিল অনেক হনুমান,এত জনমানবে তাদের ভয়ডর নেই;তারাও বেশ রাজকীয় মেজাজে মনের সুখে সুস্বাদু গাঁদাফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল,যেন কোনো লোভনীয় মিঠাই খাচ্ছে।

শিসমহলের কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হলাম।

আমের দুর্গের মধ্যেই আছে মানসিং মহল।

দ্বিতীয় দিন গেলাম জয়গড় কেল্লা দেখতে।সেটি আমের কেল্লাটির থেকেও ওপরে। কেল্লাটি বানিয়েছিলেন মহারাজ জয়সিং।এটি মূলত সৈন্যদের জন্য বানানো।

মহারাজ জয়সিং একটি কামান নির্মাণ করান যার নাম জয়বান।

জয়বান

এটি চাকার ওপর পৃথিবীর সবথেকে বড় কামান। মহারাজ জয়সিং নাকি একদিন একবার ঐ কামানটিকে পরীক্ষা করার জন্য কামান থেকে গোলা ছোঁড়েন;গোলাটি যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানে একটি ঝিল তৈরী হয়, যার নাম গোলিমার তালাব। দূর্গে একটি জলাধার আছে যা অতি বৃহৎ;সেখানে দশহাজার সৈন্যের জন্য দুবছর যাবৎ পানীয় জল মজুত রাখা যেত।

এরপর আমরা চড়লাম উটের পিঠে।দেখ কি সুন্দর মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দেখলাম সওয়াই প্রতাপ সিং এর তৈরী জলমহল,যেটি মানসাগর সরোবরে স্থিত।গ্রীষ্মকালে একটু শীতল পরিবেশে থাকার জন্যই এটি নির্মিত হয়।

শুনলাম রাজস্থানী বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গীত।

এ হচ্ছে সিটি প্যালেস।

মহারাজ মাধো সিং যখন ১৯০২ সালে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন তখন বিশালকায় দুটি রৌপ্যপাত্রে গঙ্গাজল নিয়ে গিয়েছিলেন।

তৃতীয় দিন দেখলাম রাজা সওয়াই জয়সিং এর তৈরী যন্তরমন্তর।সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিনায়ন দেখার জন্য নাড়ীবলয়।'বৃহৎ সম্রাট যন্ত্র' নামে সবথেকে বড় সূর্যঘড়ি।

গণেশ মন্দিরে গিয়ে গণেশজীকে প্রনাম করে দেখে এলাম বিড়লা মন্দির।রাতে চৌকিধানী গিয়ে দেখলাম রাজস্থানী নৃত্য।

দড়ির ওপর খেলা বাইস্কোপ আর পুতুল নাচে ছোটোবেলাকে আবার ফিরে পেলাম।

তিন রকম রুটি ও নানারকম মন মাতানো পদের রাজস্থানী থালি আহারে মন ভরে গেল। এবার ফেরার পালা।পরেরদিন সকালে ট্রেন। তাই তোমাকেও বলি,যাও নিজের চোখে দেখে এসো ইতিহাস কে।দেখবে সে কখন তোমার বন্ধু হয়ে গেছে।

দ্বৈতা গোস্বামী
গুরগাঁও, হরিয়ানা

দৈত্য ক্যাক্টাসদের দেশে

এবারে আমার লেখা পাঠাতে দেরী হোলো। হঠাৎ জরুরী কাজে আমাদের ১৪০০ মাইল দূরে যেতে হলো। ফিরে আসার সময় পিউ আর আমি একটা দোকানে বাজার করছিলাম – সেই দোকানে দেখলাম মনসা গাছের পাতা বিক্রি হচ্ছে। লোকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কাঁটা সহ মনসা পাতা – সেই পাতা কিভাবে রান্না করে খাওয়া যায় আমরা তো ভেবেই পেলাম না। তাই ভাবলাম তোমার কাছে জানতে চাই। জানো তুমি? কি ভাবে রান্না করে মনসা পাতা?

মনসা গাছের কথায় বলি পিউ আর আমি গেছিলাম একটা জায়গায় যেখানে ৫০ ফুট উঁচু মনসা গাছ আছে! অবাক হলে? সেই যায়গায় ৩০ থেকে ৫০ ফুট মনসা গাছে ভরা। গাছের কাঁটা ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা। জায়গাটা মরুভূমি। নাম সোনোরান মরুভূমি। আমেরিকার দক্ষিন-পশিচম প্রান্তে। অ্যারিজোনা প্রদেশে। সাগুয়ারো ন্যাশনাল পার্ক। সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সোনোরান মরুভূমিতেই জন্মায় এই ধরনের ক্যাকটাস গাছ।

কত লম্বা ক্যাকটাস দেখেছো? ক্যাকটাস গাছ গুলো দেখলে মনে হয় গাছ নয়, যেনো সরোপোড ডাইনোসর এর পা

সোনোরান মরুভূমিতে অনেক ধরনের ক্যাকটাস গাছ আছে। তবে সাগুয়ারো হল বিখ্যাত। এদের কিছু গাছের বয়স ১৫০ বছরেরো বেশী। সাগুয়ারো ক্যাকটাস এর একটা শাখা বড় হতে ৭৫ বছর লেগে যায়। বিশেষত বসন্ত কালে এই গাছ খুব সুন্দর লাগে। সে সময় গাছে ফুল আসে, সাদা ফুলে গাছের ডগা গুলো ভোরে যায়। যেদিকে চোখ যায় চারিদিক বড় বড় ক্যাকটাস গাছে ভরা – আর গাছের ডগা ফুলে ভরতি। মৌমাছি উড়ে উড়ে মধু খাচ্ছে। সে এক দেখবার মতো জায়গা।

সাগুয়ারো ফুল, মৌমাছি ঘুরছে

ন্যাশনাল পার্ক এর সামনে আমরা সবাই

যেদিকে দু চোখ যায় সব যায়গায় শুধু ক্যাকটাস গাছে ভরা। গাছের ডালে পাখিরা গর্ত করে বাসা বানায়। জানো কি ক্যাকটাস গাছের বয়স হিসাব করা খুব মুস্কিল, যদি না জানা থাকে কবে গাছটা

বসানো হয়েছে। কারন ক্যাকটাস গাছেতে অন্যান্য গাছের মত কোনো ring থাকে না যাতে বয়স গোনা যাবে। নিচের ছবিতে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে – যাতে আন্দাজ করা যায় সাগুয়ারো ক্যাকটাস এর বয়স।

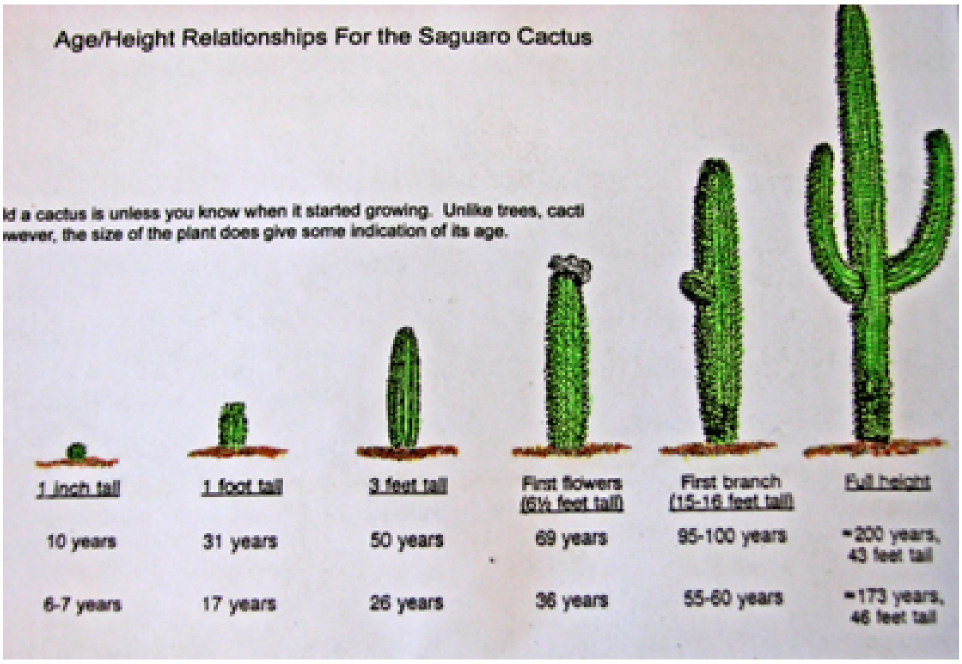

সাগুয়ারো গাছের বয়স অনুপাতে উচ্চতার তালিকা

যেদিকে তাকাই কাক্‌টাস

বসন্ত কালে ক্যাকটাস গাছে ফুল আসে। ঐ অঞ্চলে আরো অন্য অন্য ক্যাকটাস গাছ ও আছে। ছোলা ক্যাকটাস, প্রিকলী পেয়ার, অরগ্যান পাইপ, ব্যারেল ক্যাকটাস। নিচে দুটো ছবি দিলাম।

আমরা ছবি তোলার জন্য সময় সময় রাস্তা থেকে সরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিলাম। আমাদের

প্যান্ট ক্যাকটাস এর কাঁটাতে ভরে গেছিল। কাঁটা বার করতে আমাদের নাজেহাল অবস্থা।

লেখা ও ছবিঃ
দেবাশীষ পাল
রচেস্টার, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

সাগুয়ারো ন্যাশনাল পার্ক সম্পর্কে আরো জানতে হলে দেখতে পারো এই লিঙ্কটি।
গাছের বয়স-উচ্চতা তালিকাটি নেওয়া হয়েছে এই লিঙ্ক থেকে।

ছবির খবর: পথের পাঁচালী

বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটা সেটা খানিকটা জংলী গাছে ভরা। সেই পথ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে একটা পুঁচকে মেয়ে। তার নাম দুর্গা। পালাচ্ছে কারণ সে লুকিয়ে কতকগুলো ফল পেড়েছে পাশের বাড়ির বাগান থেকে।

তার বুড়ি পিসি ফল খেতে ভালোবাসে।লুকিয়ে লুকিয়ে কোচড় থেকে ফলগুলো পিসিকে দেয়। কয়েকটা

ডাঁশা পেয়ারা পিসি যত্ন করে তুলে রাখে মাটির মালসায়।

মা সর্বজয়ার এইসব একদম ভালো লাগে না। তিনি জানেন যে বাগান থেকে দুর্গা ফল নিয়ে আসে একটা সময় তাঁদের ছিলো। কিন্তু এখন নেই। টাকা ধার নেওয়ার জন্য বাগানটা জমা রাখা আছে এক আত্মীয়ের কাছে। দুর্গার ফল পাড়া নিয়ে তাই নিত্য ঝামেলা। এদিকে মায়ের সাথে ঝগড়া করে বুড়ি পিসি ইন্দিরঠাকরুন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। দুর্গার মন খারাপ হয়। কিন্তু তার মন খুব একটা বেশিদিন খারাপ থাকে না। কারণ তার বাড়িতে...তার মার কোল আলো করে আসে তার পুঁচকে আদরের ভাই অপু।

এরপর থেকেই যেটা হবে আমরা অপু আর দুর্গাকে সবসময় দেখবো কখোনো গ্রামের রাস্তায়...টোলে...যাত্রার আসরে...বাবা হরিহরের সাথে গল্পে...কিম্বা রেলগাড়ি দেখতে কাশফুলের সেই

বিশাল জঙ্গলে।

১৯৫৪ সালের ২৬ আগষ্ট পথের পাঁচালী মুক্তি পেয়েছিলো। আর ঠিক তারপর থেকেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস যেন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। একটা পথের পাঁচালীর আগের যুগ। আর একটা পথের পাঁচালীর পরের যুগ।

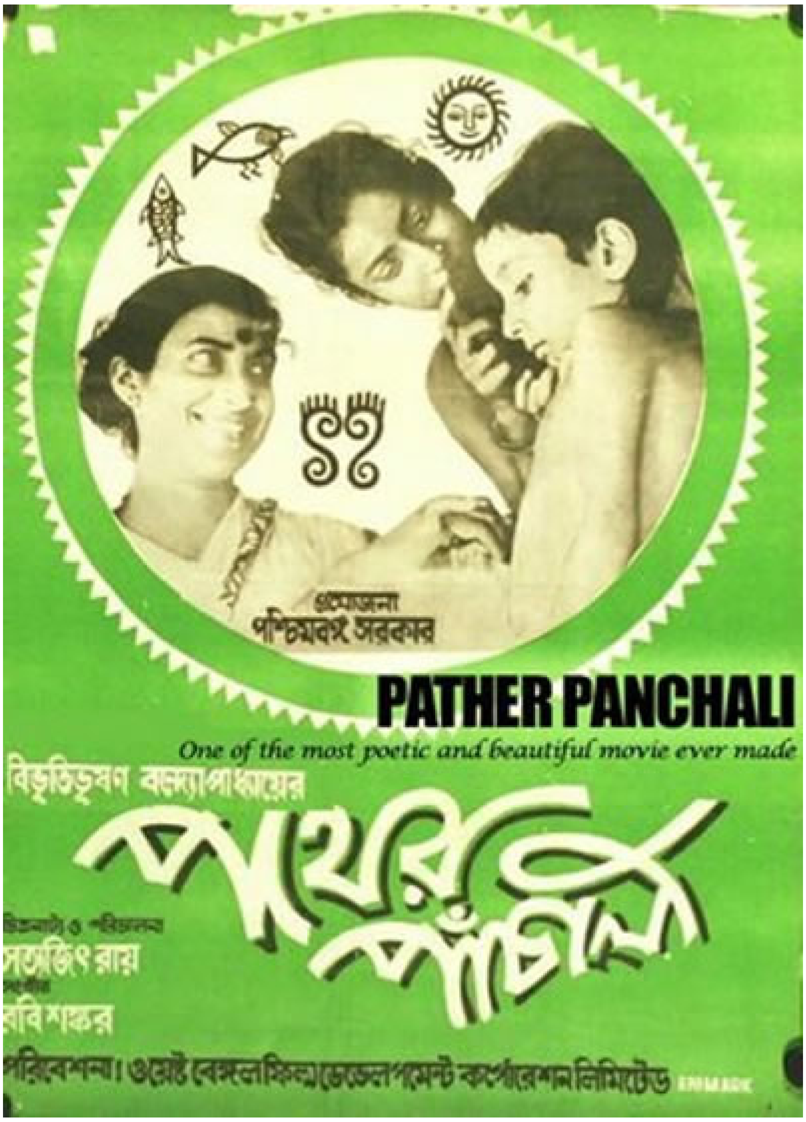

ছবির পোস্টার

এই ছবির পরিচালক কে ছিলেন জানো তো? ঠিক ধরেছো...সত্যজিত রায়। আর লেখক? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছামতীতে আলোচনা করেছি। আগের সংখ্যাগুলো একটু চোখ বোলালেই তা দেখতে পাবে। তুমি প্রশ্ন করতেই পারো...কী ছিলো এই ছবিতে যা মনে হলো একদম আনকোরা নতুন? তুমি যদি এই ছবিটা খুব মন দিয়ে দেখো তাহলে হয়তো নিজেই বুঝতে পারবে।

তখন সত্যজিত রায় এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরী করেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালীর

ছোটদের সংস্করণ আম আঁটির ভেঁপুর ছবি আঁকার দায়িত্ব তাঁর কাছে এলো।

উপন্যাসটি পড়ে ভালো লাগলো খুব। মনে মনে প্রস্তুতি নিতে থাকলেন এটাই হবে তাঁর প্রথম ছবি। অনেক কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে ছবির কাজ শেষ হলো। তারপর লোকে যখন দেখলো একটা মেয়ে...তার ভাই...তাদের পিসি...বাবা...মা...একটা গ্রাম...কষ্টের সাথে যুঝে চলা একটা পরিবার...সর্বোপরি নিজের গ্রাম ভিটে মাটি ছেড়ে তাদের চলে যাওয়া। দুর্গার মৃত্যু...অপুর মন কেমন এযেন খুব চেনা কিন্তু ঠিক এমন ভাবে আগে তো দেখিনি সব। মনে মনে ভাবলো সবাই। আর আবার একবার নয় বারবার দেখতে থাকলো পথের পাঁচালী।

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে পথের পাঁচালী পুরস্কার পেল প্রচুর। আর ভারতীয় ছবি জগত সভায় তার আসন করে নিলো চিরদিনের জন্য।

কেউ ভুলতে পারলো না রেল গাড়ি দেখতে না পাওয়া, জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে মরে যাওয়া দুর্গাকে...তার খুড়খুড়ি বুড়ি পিসিকে...নিশ্চিন্দিপুরকে...মা সর্বজয়া...বাবা হরিহর...
আর অবশ্যই অপুকে।

কল্লোল
উত্তরপাড়া, হুগলি

<u>বেনহুর-হলিউড ধ্রুপদী ছবি</u>

ছবি,ছায়াছবি, চলচ্চিত্র, ফিল্ম বা সিনেমা, যে নামেই ডাকো – এই মাধ্যমের একটা মায়া আছে। এ যেন এক আধুনিক রূপকথা। যন্ত্রের সাহায্যে অবাস্তব কে বাস্তব সাজিয়ে দিলে যে ম্যাজিক তৈরি হয়, তাকেই তো সিনেমা বলে! না হলে আর কেন ছোট বড় সবাই সিনেমা হলে যেত ছবি দেখতে? আমি অতীতের কথাই বলছি। কেননা আমাদের ছোটবেলাতেও তো টিভি ছিলনা। এখনকার মত আলো ঝলমলে বৈঠকখানায় বসে গল্প করতে করতে টিভি দেখা, আর অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে বিশাল পর্দার সামনে জমজমাট কাহিনির টানাপোড়েনে জুড়ে থাকা আরেক জিনিষ।

এরকমই ছিল আমাদের ছোটবেলা। কমলালেবু কি বাদাম হাতে আমরা মামা বা পিসেমশাইয়ের সঙ্গে সাহেবপাড়ায় মেট্রো বা এলিটে ভীড় জমাতাম 'বেনহুর' দেখব বলে। 'বেনহুর' গল্পটা পড়েছ কি? বা দেখেছ? ১৮৮০ সালে লেখা লিউ ওয়ালেসের উপন্যাস বেনহুরঃ এ টেল অব দ্য ক্রাইস্ট অবলম্বনে এই ছবিটি ১৯৫৯ সালে তৈরি করেন বিখ্যাত চিত্র পরিচালক উইলিয়াম ওয়াইলার।

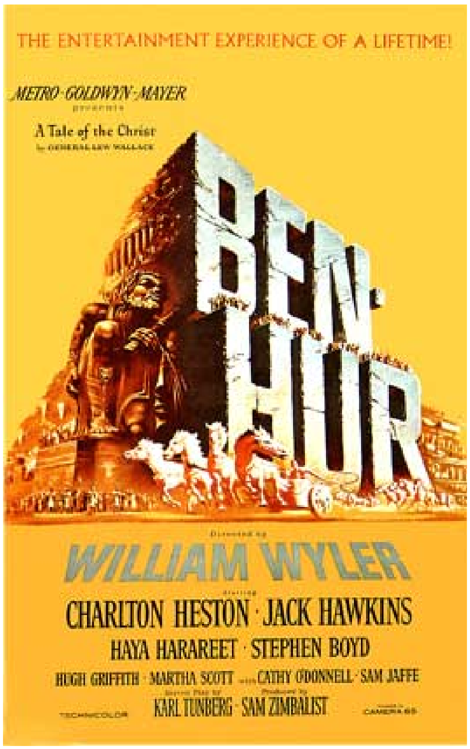

ছবির পোস্টার

এই গল্প অবলম্বনে এই নিয়ে তৃতীয়বার ছবিটি তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু এই ছবিটির সঙ্গে আগের দুইটি প্রচেষ্টার কোন তুলনাই চলে না। এই ছবিটা ছিল এক অসাধারন ছবি, যেখানে এক অসাধারন গল্প বলা হয়েছিল। কি নেই সে গল্পে? বন্ধুতা-শত্রুতা, রাজনীতি-ধর্ম, খেলা-বাজি, দ্বন্দ্ব-মিল, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আশা-নিরাশা, আনন্দ-দুঃখ, ভালবাসা-হিংসা - মানুষের জীবনের সব রকম অনুভূতির ছোট ছোট গল্প ছড়িয়ে আছে এই বিশাল গল্পের মধ্যে;

বেনহুর এর ভূমিকায় চার্লটন হেস্টন

মেসালাহ্‌ চরিত্রে স্টিফেন বয়েড

আছে যীশুখ্রীষ্টের গল্প;

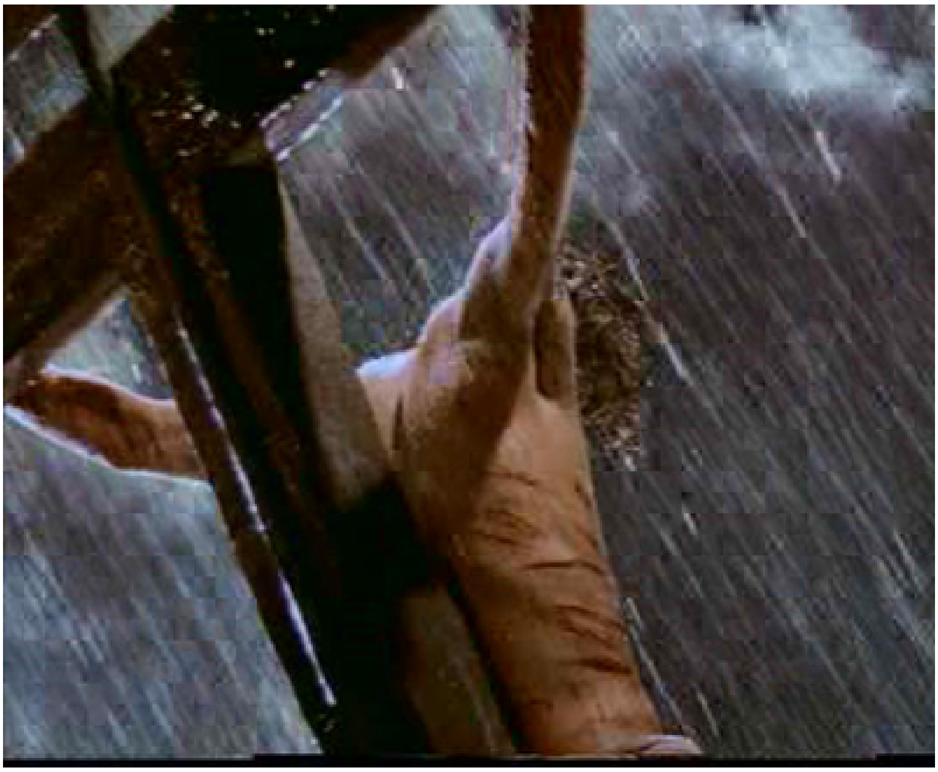

আছে রোম সাম্রাজ্যের গল্প;

আছে মানবসভ্যতার গল্প।

আর তাই এই গল্পটা, বা সেই গল্প নিয়ে তৈরি এই ছবিটা, আমাদের কাছে কখনও পুরোনো হয়না।

কি সেই রহস্যটা কি, যা যুগে যুগে বেনহুরের মত বানানো গল্পের সঙ্গে আমাদের বেঁধে রাখে? আসলে যেকোন ছবি বা ফিল্মের মধ্যে কোন অতীত বা ভবিষ্যত থাকেনা। যেকোন গল্পই আমাদের কাছে সে মূহুর্তের গল্প। তাই বেনহুর যখন শিকল বাঁধা অবস্থায় দাঁড় টানতে থাকে, বা মেসালা যখন রথের দৌড়ে অংশ নেয়, আমরাও মনে মনে দৌড়াই। আমাদেরও গায়ে যেন কৃতদাসের মত ঘামের দানা ফুটে ওঠে।

হলিউড যে সারা বিশ্বকে প্রথম থেকেই জিতে নিল, তার প্রধান কারন এই যে, সেই ছবিগুলির মধ্যে আমরা মিশে যেতে পারি। নিজেদের সনাক্ত করতে পারি। আর কোথাও মনের গোপনে আমরা চাই-যে ভালরা জিতে যাক, আর খারাপরা হেরে যাক। আমরা যে আসলে নিজেদের জীবনেও সেইরকমই ঘটনা চাই। হলিউড ধ্রুপদী ছবি আমাদের এই ইচ্ছাকেই পূরণ করে। এ যেন এক ইচ্ছাপূরণের ম্যাজিক।

কিভাবে এই ইচ্ছাপূরণ হয়? কিভাবে গল্প বলে হলিউডের ধ্রুপদী ছবি? দেখা যাবে, প্রত্যেকটা ছবিরই একটা শুরু, একটা নাটকীয় মধ্যভাগ, ও একটা সুন্দর সমাপ্তি থাকে। এর ফলে, আমরা যারা দর্শক, আমাদের ওপর কোন চাপ থাকে না। আমরা জানি, বেনহুর শেষ পর্যন্ত বন্দীদশা কাটাতে পারবেই। সে তার মা আর বোনের কাছে ফিরতে পারবে, তার বাড়ি-ঘর ফিরে পাবে। যখন রথ চালানোর প্রতিযোগিতা হয়, আমরা টানটান হয়ে বসে দেখি বেনহুরের রথের চাকা প্রায় খুলে যাচ্ছে, কিন্তু তখনও আমরা মনে মনে জানি এবং আশা করতে থাকি যে, বেনহুর ঠিক জিতে যাবে।

এইভাবেই, হলিউডের কোন ছবিই আমাদের মধ্যে কোন আলাদা করে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেনা। ছবির শুরুতে যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সবগুলির সুন্দর সমাধান হয়ে যায়। ঠিক যেন, কঠিন পরীক্ষা বা পরিশ্রমের শেষে এক সুন্দর ফলাফল। একেই ভারি ভাষায় নিষ্পত্তি বা closure বলে।

তাই বলে এইরকম ভাবে গল্প বলা সহজ কথা নয়। বিভিন্ন আলাদা আলাদা দৃশ্যগুলিকে যেমন তেমন ভাবে জুড়ে দিলেই এইরকম মসৃন ভাবে গল্প বলা যায়না। ছবির বিভিন্ন শট বা দৃশ্যগুলিকে জোড়ারও নিয়ম আছে, যাকে বলে continuity। সেই নিয়ম মেনে তৈরি করা ছবি দেখলে মনে হয় - ঠিকই তো, এই ঘটনার পরেই তো ওই ঘটনা দেখানো উচিত।

ছোটবেলায় বেনহুর দেখে এরকম ভাবে অবাক হওয়ায়, বিস্ময়ে, মুগ্ধতায় তলিয়ে গেছিলাম। সব যুগেই এইরকম হয়। আজকের দিনে, তুমি যখন 'হ্যারি পটার' বা 'তারে জমিন পর' দেখ, তখন তুমিও ঠিক একইরকম অবাক হয়ে যাও, তাই না?

একদিন থেকে দেখতে গেলে, 'বেনহুর' কিন্তু প্রায় স্বপ্নের কারখানা থেকে তৈরি হওয়া এক শিল্প। আসলে '৬০ এর দশকের শেষে, বিখ্যাত এমজিএম কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছিল। তারা বেপরোয়া হয়ে, শেষ চেষ্টা হিসাবে, ১৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে 'বেনহুর' তৈরি করে। আর কি আশ্চর্য, 'বেনহুর', ঠিক যেন নোয়া'র নৌকার মত তাদেরকে বাঁচিয়ে দেয় ৭৫ মিলিয়ন ডলার ফেরত দিয়ে!

'বেনহুর'-এর সাফল্য অবিশ্বাস্য। অস্কারের ইতিহাসে এই ছবি প্রথম 'সেরা ছবি' সহ মোট১১টা পুরস্কার পায়, যা পরে 'টাইটানিক' এবং' লর্ড অফ দ্য রিংস' ছবি ছাড়া আর কেউই ছুঁতে পারেনি।

বেনহুর ছবিটি, তার গল্পের দৌড়ের বাজির মত, নিজেই যেন এক বাজির খেলা। প্রথমে জনপ্রিয় অভিনেতা বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার কে নাম ভূমিকায় অভিনয় করতে বলা হয়। তিনি রাজি হলেন না। তখন পল নিউম্যান এর দরজায় কড়া নাড়া হয়। তিনিও সাড়া দেন নি। অবশেষে চার্লটন হেস্টন রাজি হয়ে যান। পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন বিখ্যাত পরিচালক উইলিয়াম ওয়াইলার। তাঁর ছবি করার বৈশিষ্ট হচ্ছে লম্বা লম্বা শট। অথচ, বেনহুরের সবচেয়ে বিখ্যাত দৃশ্য -রথের দৌড়, তিনি পরিচালনাই

করেননি। ওই দৃশ্য পরিচালনা করেন অ্যান্ড্রিউ মারটন নামে একজন অখ্যাত নির্দেশক। আর আরো অবাক কথা, যে এই সিকোয়েন্স মোটেই হলিউডে তৈরি নয়। রোমের বিখ্যাট চিনেচিত্তা স্টুডিওতে তৈরি। এই পুরো সিকোয়েন্স চিত্রায়িত করতে সবশুদ্ধ সময় লেগেছিল তিন মাস। সেট এর মাপ ই ছিল ৭৩হাজার বর্গ মিটার। ১৮টা রথ বানানো হয়েছিল। ১৫,০০০ এক্সট্রা নিয়োগ করা হয়। বেনহুর রূপী চার্লটন হেস্টন কে একমাস সময় দেওয়া হয় রথ চালানো শেখার জন্য। মেসালা রূপী স্টিফেন বয়েড অবশ্য তার অর্ধেক সময় নেন শিখতে।

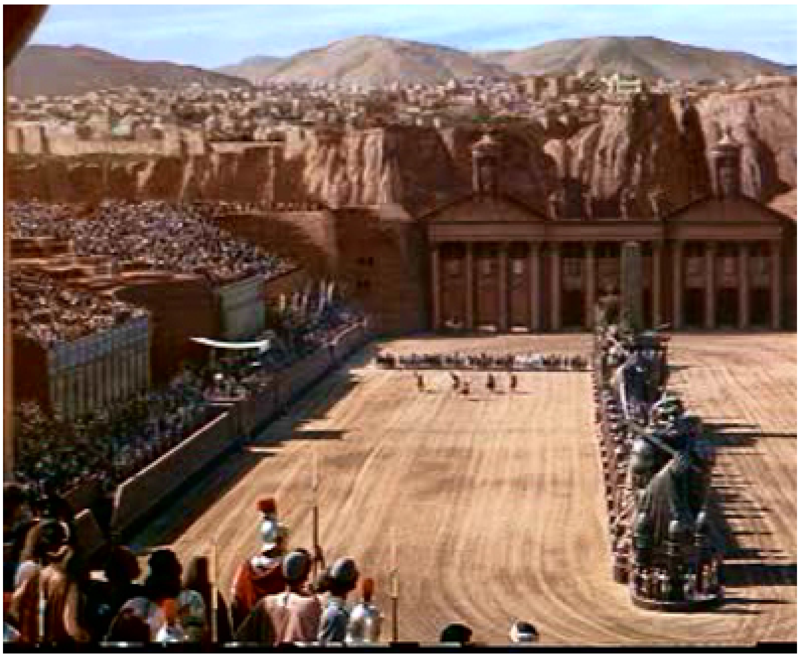

বেনহুর ছবির বিখ্যাত রথের দৌড়এর দৃশ্য

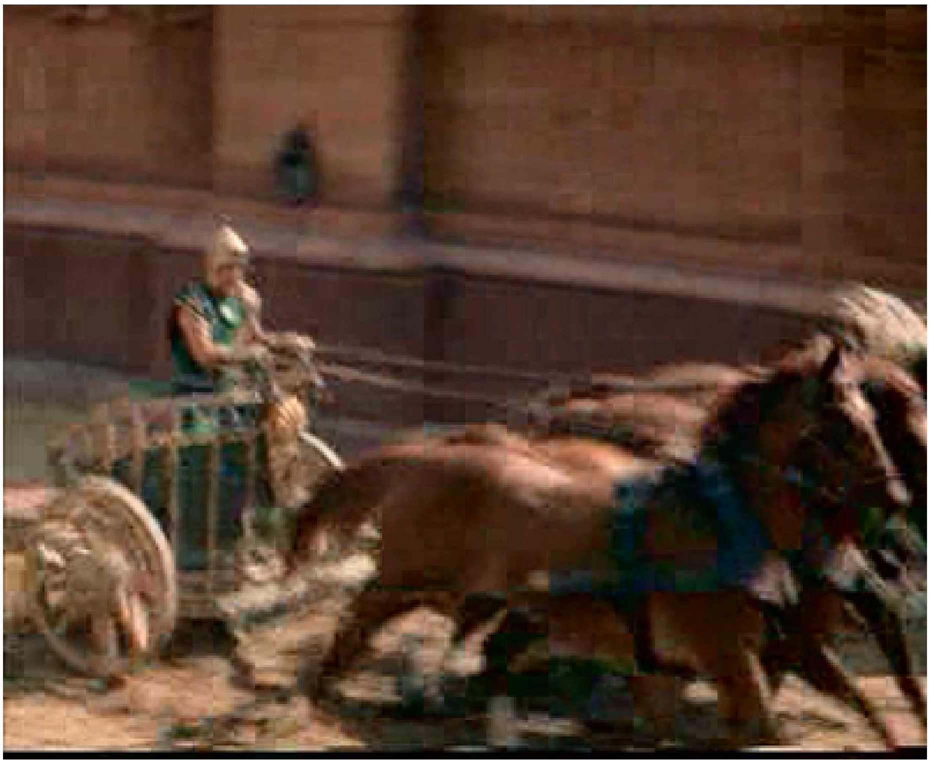

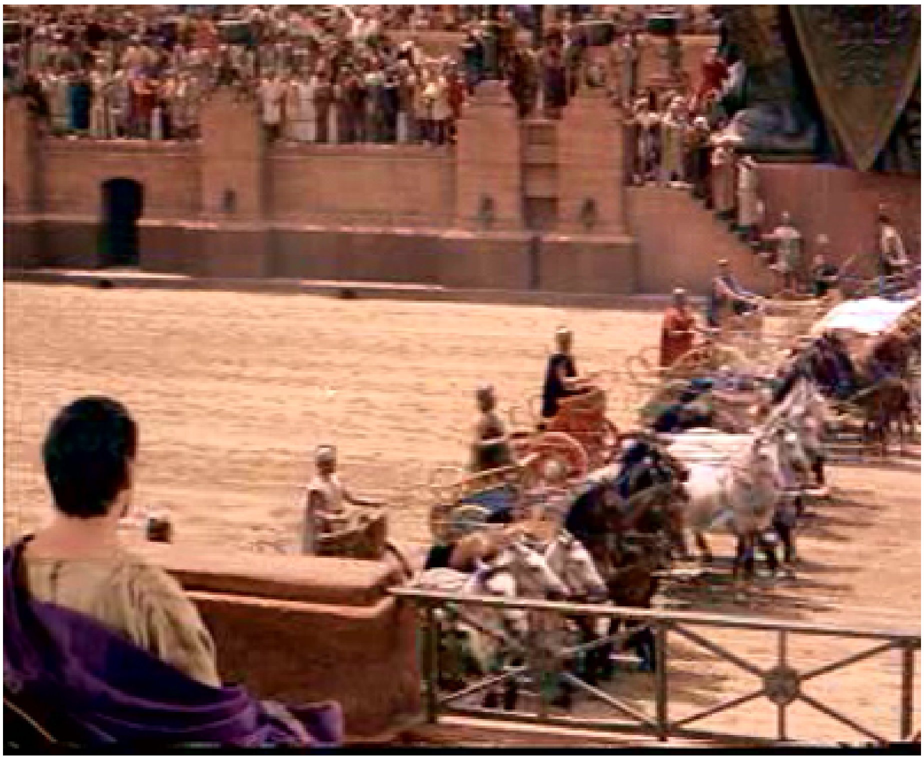

এইবারে বুঝলে তো, গত সংখ্যায় কেন বলেছিলাম, কারখানায় যেমন ভাবে কোন পন্য বানানো হয়, ঠিক তেমনভাবেই হলিউডের প্রথম যুগে ছবি বানানো হত। 'বেনহুর' যদি না দেখে থাকো, তাহলে অবশ্যই দেখে নাও। ক্লাসিক বা ধ্রুপদী হলিউড সিনেমার এক অসামান্য নিদর্শন এই ছবিটা।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, চলচ্চিত্র বিদ্যা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া
সারেগামা হোম ভিডিও

পরশমণি: শীত গরমের চক্কর

শীত-গরমের চক্কর

শীত আর গরমের চক্করটা কেমন বুঝছ? এই মাস দু'এক আগেই ঠান্ডায় হি হি করে কাঁপছিলে, সোয়েটার-জ্যাকেট না চাপালে চলছিল না,আবার এখন দেখ গায়ে একটা জামা রাখতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে।

একটা প্রশ্ন করি? বলতে পারো, শীতকালে শীত আর গরমকালে গরম লাগে কেন? কি ভাবছ! বোকা বোকা প্রশ্ন হয়ে গেল? মোটেই না। বুঝিয়ে বলি আগে, তারপর বলো প্রশ্নটা ঠিক, না বোকা বোকা।

এটা ত জানা কথা যে রোদে দাঁড়ালে গরম লাগে কারণ রোদে আলো ছাড়াও আছে আরও একটা জিনিষ, যার নাম হল 'তাপ'- এই তাপের জন্যই গরম লাগে। তাই ছাতার তলায় বা গাছের নীচের ছায়াতে দাঁড়ালে গায়ে তাপ লাগতে পারে না আর সেজন্য গরমও লাগে না।

তাপ কি জান? তাপ এক ধরনের 'শক্তি' ইংরাজিতে যাকে বলে এনার্জি (energy)। একে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়, মানে বুঝতে পারা যায়। এখন যেমন বুঝতে পারছ যে গরম পড়েছে- কারন চারপাশে তাপ বেড়েছে। এই তাপ কিছু কিছু ধর্ম (property) মেনে চলে। তার মধ্যে প্রধান হল যে, সে সব সময় গরম জিনিষ থেকে ঠান্ডা জিনিষের দিকে চলে যেতে চায়। যার মধ্যে যায়, সে জিনিষটা গরম হয়ে ওঠে। সুতরাং যা থেকে তাপ চলে যায় সে যে ঠান্ডা হবে এটাই স্বাভাবিক। হয়েও যায়।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। 'তাপের' সংগে 'গরম', 'ঠান্ডা' বা 'উষ্ণতা' কিন্তু গুলিয়ে ফেলো না,ঠিক যেমন 'চিনির' সাথে 'মিষ্টি' গুলিয়ে ফেলা যায় না। চিনি আর মিষ্টি কি এক জিনিষ? চিনি থাকলে তবে না মিষ্টি হবে! ঠিক তেমনি তাপ পেলে কোন জিনিষ গরম হবে আবার চলে গেলে সে জিনিষটা ঠান্ডা হয়ে পড়বে।

রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনের তাপে তার ওপরে কোন পাত্রে রাখা ঠান্ডা জল গরম হয়ে যাবার কারণ এটাই। তাই বলে আবার ভেবে বসো না যে গ্যাসের উনুনটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। সেটা হয়ই বা কি করে? গ্যাস পুড়ে পুড়ে ওখানেই ত তাপ তৈরী হচ্ছে কিনা! আর জানই ত সিলিন্ডার থেকে অনবরত গ্যাস এসেই যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, গ্যাস শেষ হয়ে গেলে বা গ্যাসের যোগান বন্ধ করে দিলে, উনুনটা আর গরম থাকবে না।

এখন আমাদের শরীরের কথা ভাব। এটা সব সময় গরম থাকে। শরীরের উষ্ণতা কত জান ত? ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছা কাছি। শরীর উষ্ণ থাকে কি করে? আমরা নানা ধরনের খাবার খাই। সেই খাবার আমাদের শরীরে শক্তি জোগায়, আর সেই জন্য আমাদের দেহ উষ্ণ থাকে।তাই যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন শক্তি পাবার জন্য আমাদের খাওয়া দাওয়া করে যেতে হয়। আগে যে গ্যাস উনুনের কথা বললাম, ঠিক সেটার মত। খাবার থেকে অনবরত শক্তি এসেই যাচ্ছে।

এবার ভাবা যাক যে এখন শীতকাল। এ সময়ে বাতাসের উষ্ণতা শরীরের উষ্ণতা থেকে কম থাকে। ধরি কোন সময়ের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সে সময় শরীরের উষ্ণতা তো সেই ৩৭ ডিগ্রীতেই আছে। অর্থাৎ শরীরের উষ্ণতা বাতাসের চেয়ে বেশী। তাহলে তাপের নিয়মমত(যেটা আগে বলেছি) এবার তাপ শরীর থেকে বাইরে বেরোতে থাকবে। এতে শরীরটা ঠান্ডা হতে থাকবে অর্থাৎ শীত করবে। এই জন্যই ত শীতকালে শীত লাগে।

এমন সময়ে আমরা কি করি? গরম জামা গায়ে দিই। কেন বল দেখি? এটাতো সহজ কথা, যাতে তাপটা বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে। তাহলে গরম জামাটা এমন কি বস্তু যে শীতকে আটকে দেয়? গরম জামা বললেও আসলে জামাটা সত্যিই গরম নাকি? মোটেও না। তবে জামাটা শরীরের তাপকে কি ভাবে আটকায়? তা বলি এবার।

গরম জামা

আগে একটা সংখ্যায় 'সুপরিবাহি' আর 'কুপরিবাহি' বস্তুর কথা বলেছিলাম, মনে আছে? নেই? যার মধ্যে দিয়ে তাপ সহজে চলাচল করতে পারে সেটা তাপের সুপরিবাহি। যেমন কোন ধাতব জিনিষ। আর যার ভিতর দিয়ে তাপ চলতে পারে না সেটা তাপের কুপরিবাহি। কাচ, কাগজ বা কাপড়চোপড়--এ রকম জিনিষ হল কুপরিবাহি। আর বাতাসও এই রকমই একটা বস্তু।

একটা গরম জামা, ধর উলের সোয়েটার, দেখ। সুতো গুলো কেমন মোটা মোটা আর কোঁচকানো। শুধু তা-ই নয় জামাটা কেমন ঢিলাঢালা করে বোনা। কোঁচকানো,মোটা মোটা সুতো আর ঢিলাঢালা বুনোটের ফাঁকফোকড়ে আটকে থাকে প্রচুর বাতাস যা কিনা তাপের একেবারে হদ্দ বাজে কুপরিবাহি। এর ভিতর দিয়ে তাপ সহজে বাইরে যেতে পারে না। তাপ বাইরে যেতে না পারলে শরীর তো গরম থাকবেই, না কি বল? সেজন্যই সোয়েটারকে বলি গরমজামা।

শীত যদি খুব বেশী পড়ে, একটা সোয়েটারে কাজ না চলে, তখন একটা জ্যাকেট চাপিয়ে নিলে শীত একদম জব্দ। কারণ সোয়েটার আর জ্যাকেটের ফাঁকে আটকে যায় পুরু বাতাসের স্তর,যেটা মোটা কুপরিবাহির কাজ করে।

রাতে ঘুমোবার সময় কম্বল বা লেপও একই রকমভাবে কাজ করে। কম্বলের উলের ফাঁকে বা লেপের তুলোর ফাঁকে আটকে থাকা বাতাস দারুন সুন্দর কুপরিবাহির কাজ করে থাকে।

লক্ষ্য করে দেখেছ কিনা জানি না যে যখন বেশি শীত পড়ে মা তখন লেপ-কম্বল-কাঁথা রোদে দেন। কেন বলত? যাতে তুলো ফেঁপে উঠে আরও বেশি বেশি বাতাস নিজের ভিতর ঢুকিয়ে নেয়, যাতে লেপটা আরও কুপরিবাহি হয় আর বেশি গরম আর আরামদায়ক হয়।

তুলো ফেঁপে ওঠে কেন? এর কারণ, আমাদের চারপাশের প্রায় সব জিনিষ তাপ পেলে আয়তনে বেড়ে যায় অর্থাৎ বড়সড় হয়ে যায়। এটা খুব সহজেই বুঝতে পারবে যদি একটা কাজ কর। একটা বেলুনকে অল্প বাতাস ভরে মুখটা ভাল করে বেঁধে রোদে ফেলে রাখো, কিছুক্ষন পরে দেখবে যে সেটা ফুলে বড় হয়ে গেছে।

শীতে কম্বলের তলায় শুয়ে ভারি আরাম হয়

কেন হল এমন? ঐযে বললাম, তাপ পেলে সব জিনিষ আয়তনে বেড়ে যায়! এখানে রোদের তাপে বাতাস আয়তনে বড় হয়ে বেলুনকে বেশি করে ফুলিয়ে দিল। ঠিক এমনি করে লেপের ভেতরে আটকে থাকা বাতাস তাপ পেয়ে ফুলে উঠে তুলোকে ফাঁপিয়ে দেয়, আর সেই জায়গায় আরও বাতাস ঢুকে পড়ে।

উত্তর মেরু অঞ্চলের গ্রীনল্যান্ডের নাম শুনেছ ত, যেখানে এস্কিমোরা থাকে? ওদের ছবি দেখেছ? কেমন লোমশ পোষাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখে যাতে কোন প্রকারেই শরীরের সামান্য তাপও বাইরে যেতে না পারে। ঐ মোটা লোমশ পোষাক সেই কাজটা করে। তবে ওখানে এতই ঠান্ডা যে এত কিছু করেও তাপ শরীরে ধরে রাখা ভারি মুশকিল হয়ে যায়। তাই শরীরের তাপ বাড়াতে ওরা অনেক চর্বি খায়, এমনকি শীল মাছের চর্বি কাঁচাও চিবিয়ে খায়।

এস্কিমো

এভারেস্ট শৃঙ্গজয়ী তেনজিং নোরগে বা স্যার এডমন্ড হিলারীর ছবি দেখেছ নিশ্চয়ই। দেখবে সেইরকম মোটা মোটা ফাঁপা পোষাক পড়া ওঁদের।

শীতকালে একটা কাজ করে দেখতে পার। একটা সোয়েটার না পরে তার বদলে দু'টো পাতলা জামা পরে দেখো, প্রায় একই ফল পাবে। কারণটাও একই। দু'টো জামার ফাঁকে অনেকটা বাতাস আটকে থাকতে পারে।

শীতের ব্যাপারটা তো বোঝা গেল, নাকি। আর গরমের ব্যাপারটা? এতে উলটো কান্ড ছাড়া আর কি হবে?

এখন এই গরমের সময় ধর বাইরের উষ্ণতা ৪০ ডিগ্রী। আর তোমার শরীরের তাপমাত্রা ত সেই ৩৭ ই আছে। তার অর্থ তোমার দেহ বাইরের তুলনায় ঠান্ডা। তাহলে নিজের ধর্ম অনুযায়ী তাপ কি করবে? তোমার ঠান্ডা দেহে ঢুকে পড়বে। তখন গরমে প্রানটা আইঢাই করবে। এই কারণেই গরমকালে গরম লাগে। বুঝতে পারলে কথাটা? তাহলে প্রশ্নটা খুব একটা বোকা বোকা ছিল না, কি বল?

কিন্তু গরমের এই কষ্ঠ থেকে রক্ষা পাবার উপায় কি? শীত আটকাবার গরম জামার মত 'ঠান্ডা জামা' পাওয়া যায় না আমাদের আবহাওয়ায়, তবে যারা মরুভূমি অঞ্চলে থাকে তারা একরকম পোষাক ব্যবহার করে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত মোটা কাপড়ের পোষাক পরে থাকে সবসময়। কাপড় আর তার মধ্যে আটকে থাকা বাতাস বাইরের তাপকে ভেতরে আসতে দেয় না। মরুভূমিতে দিনে যেমন গরম রাতে আবার তেমনি ঠান্ডা। এই মোটা কাপড়ের পোষাকটা ঠান্ডা বা গরম - দুটো থেকেই দেহকে বাঁচায়।

বেদুইন

আমরা অবশ্য নানা রকম ঠান্ডা পানীয়, আইসক্রিম-- এ সব খেয়ে আরাম পাবার চেষ্টা করে থাকি। একটু ভাল লাগলেও সেটা একেবারেই সাময়িক ব্যাপার কোন স্থায়ী সমাধান নয়।

গরমকালে খেতে ভারি মজা

অফিস-কাছারি, বাড়িঘর, সিনেমা বা থিয়েটার হল - এ সব যন্ত্রের সাহায্যে ঠান্ডা করা হয়ে থাকে। এমন জায়গায় কিছুক্ষন থাকার পর বাইরে এলে শরীর ভীষন খারাপ হয়। হঠাত গরম লেগে সর্দিগর্মি হয়ে যেতে পারে। হিতে বিপরীত যাকে বলে আর কি। পড়াশোনা,স্কুল, খেলা - এ সব ছেড়ে বিছানায় বেশ কয়েক দিনের জন্য পড়ে থাকা, আর বিশ্রী সব ওষুধ গেলার ব্যবস্থা পাকা!

কিন্তু গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রকৃতি মা একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যখন খুব গরম পড়ে তখন খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই যে আমাদের শরীর দরদর করে ঘামতে থাকে। ঘাম কিন্তু এমনি এমনি হয় না। ঘাম শরীর থেকে বেরিয়ে বাষ্প হয় উড়ে যাওয়ার সময় দেহ থেকে তাপ নিয়ে যায়। এতে দেহ ঠান্ডা হয়। তাই উপযুক্ত পরিমান জল পান করতে হয়। তাতে শরীর ঠান্ডাও থাকে আর ঘামের জন্য উবে যাওয়ার ফলে দেহে জলের ঘাটতিও হয় না।

এই ঘাম আর তার ফলে শরীর ঠান্ডা হওয়ার ব্যাপারটা উঁচু শ্রেনীতে যখন পড়বে তখন আরও ভাল করে জানতে পারবে। ঘাম কোথা থেকে বার হয় বল দেখি! আমাদের দেহের চামড়ায় অনেক ছোট্ট ছোট্ট ছিদ্র আছে, যা খালি চোখে দেখতে পাবে না। এই ছিদ্রপথে ঘাম বাইরে আসে। সেই জন্য খেয়াল রাখতে হয় যাতে এই সব ছিদ্র পথ বন্ধ হয়ে না যায়।

গরমের নানা সমস্যা থেকে শরীরকে বাঁচাবার জন্য আমরা অনেকরকম প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে থাকি, যা অনেক সময় ঘাম বেরোবার পথকে বন্ধ করে দিতে পারে। এটা হলে দেহ ঠান্ডা ত হবেই না বরং গরমে হাঁসফাঁস করে অসুখে পড়ে যাবে। তাই বেশী গরমে কি কি করা উচিত-অনুচিত, তা ডাক্তার কাকুদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া খুব জরুরী।

খুব গরম পড়েছে, তাই সাবধানে থেক সবাই।

সন্তোষ কূমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

কমিক্‌স্‌ কাহিনী: প্রাণ ভরে...

এই ধরো পঞ্চাশ বছর আগের কথা, ভারতে তখন কমিক্স বলতে শুধুই স্পাইডারম্যান, সুপারম্যান, ব্যাটম্যান। এর মধ্যে অবশ্য রামায়ণ,মহাভারত কমিক্স আকারে প্রকাশ করা হয়েছিলো। কিন্তু ভারতীয় নতুন কমিক্স ছিলো না বললেই চলে।

ঠিক এই রকম এক সময়ে মুম্বাইয়ের 'স্যার যে যে স্কুল অব আর্টে' প্রাণকুমার শর্মা নামের এক যুবক ফাইন আর্ট নিয়ে পড়াশুনো করছিলো। তার কেনো জানি না সব সময় মনে হতো এখানে কমিক্স সেভাবে কেউ উপভোগ করতে পারে না। কমিক্স পড়ে কেউ আনন্দ পাচ্ছে না, উপভোগ করতে পারছে না। তার মনে হলো সবার হয়তো বিদেশী সুপার হিরোদের গল্প ভালো লাগছে না। কিন্তু সেই সময় খুব কম লোকই নতুন কমিক্স নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতো বা বিদেশী কমিক্সের সাথে পাল্লা দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করতো।

আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর প্রাণ 'মিলাপ' নামের এক দৈনিকে কার্টুনিস্ট হিসাবে যোগ দেন। এখানেই প্রাণ একটা কান্ড ঘটিয়ে ফেললেন। ডাব্বু নামের এক কমিক্স স্ট্রিপ তৈরী করে ফেললেন কিছু দিনের মধ্যে। তাঁর কমিক্সের চরিত্ররা হলো পাশের বাড়ির দুষ্টু ছেলেটা, পাড়ার ছোট্ট মেয়েটা, জেঠিমা, কাকু, কাকিমা। গল্প গুলো শহর কেন্দ্রিক অর্থাত শহরকে ঘিরে গড়ে উঠলো। ঠিক এর পরেই এলো চাচা চৌধুরী হিন্দি 'লটপট' ম্যাগাজিনের হাত ধরে।

চাচা চৌধুরীর কিন্তু কোনো অদ্ভুত ক্ষমতা নেই অন্যান্য সুপার হিরোদের মতো। তিনি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ, বলতে পারো প্রবীন নাগরিক বা সিনিয়র সিটিজেন যাঁর একমাত্র ভরসা 'মগজাস্ত্র', উপস্থিত বুদ্ধি। তাঁর বুদ্ধি সুপার কমপিউটারের থেকেও প্রখর। চাচী আর রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটি নেড়ি কুকুর রকেটকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। তাঁর একমাত্র ছায়া সঙ্গী সাবু, যে কিনা বৃহস্পতি গ্রহের বাসিন্দা। জানো তো বৃহস্পতি হলো সবচেয়ে বড় গ্রহ, আর তাই সাবুও লম্বা, চওড়া আর বেশ শক্তিশালী। চাচা চৌধুরীর প্রখর বুদ্ধি আর সাবুর শক্তি এই দুইয়ে মিলে গুন্ডা বদমাইশদের সাজা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। রাকা নামের এক ডাকাত হলো তাদের প্রধান শত্রু। লাল পাগড়ি, হাতে ছড়ি আর সাদা গোঁফ চাচা চৌধুরী মনে হয় সবচেয়ে প্রবীণ হিরো।

তিনি জনতেন কমিক্সের চরিত্রদের কখোনো বয়স বাড়ে না বা কমে না তাই তিনি বিভিন্ন বয়সের চরিত্রদের সৃষ্টি করলেন। যেমন পাঁচ বছরের ছোট্ট পিঙ্কি। বয়সে ছোট হলে কি হবে। সে আর তার ছোট্ট কাঠবেড়ালী কুটকুট সাড়া পাড়া দাপিয়ে বেড়ায়। প্রশ্ন করে করে সবাইকে ব্যাতিব্যস্ত করে তোলে।

আরেকদিকে আছে বিল্লু। সে স্কুলে যায়। তার আদরের কুকুরের নাম মোতি। বন্ধুরা মিলে যখন পাড়ায় ক্রিকেট খেলে তখন আশেপাশে বাড়ির জানলার কাঁচ আর আস্ত থাকে না। পালোয়ান বজরঙ্গির সঙ্গে তার যত ঝামেলা। কিন্তু বাড়িতে থাকলে বিল্লু শুধু টিভি দেখে।

এই সমস্ত কমিক্স পাঞ্জাব কেশরী, জগবানী, হিন্দ সমাচার, সন্ধ্যা টাইমস, ময়ূরা, লটপট প্রভৃতি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। পরে ডায়মন্ড কমিক্স এই গুলোকে বই হিসাবে প্রকাশ করে।

ভারতের কমিক্সের জগতে যিনি এত কান্ড ঘটিয়েছিলেন সেই প্রাণকে ওয়ার্ল্ড এনসাইক্লোপিডিয়ার সম্পাদক মরিস হর্ণ(Maurice Horn) বলেছেন "Walt Disney of India"।

১৯৯৫ সালে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব কার্টুনিস্ট তাঁকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। লিমকা বুক অব রেকর্ডে প্রাণের নাম পাওয়া যায় ভারতীয় কমিক্সস্ট্রিপে তাঁর অবদানের জন্য। শুধু তাই নয় তিনি অষ্ট্রেলিয়া কার্টুনিস্ট সোসাইটির অন্যতম সদস্য। এখন প্রাণের বয়স হয়েছে কিন্তু এখোনো থেমে থাকেনি তাঁর কলম... তুলি...কোনো কিছুই। এখোনো চাচা চৌধুরী, সাবু, রাকা বিল্লু তাদের কেরামতি দেখিয়ে চলেছে। আর আমরাও পথ হাঁটছি তাদের সাথে।

পূর্বাশা
নিউ আলিপুর, কলকাতা

জানা-অজানা

আলি, কোকো আর আমরা

একটা দশ-এগারো বছরের ছোট ছেলে। নাম তার আলি। কাঁধে তার এক বিশাল বস্তা, ওজন প্রায় ছয়-সাত কিলো। ওজনের ভারে নুইয়ে পড়েছে সে। তার মাথার কোঁকরানো কালো চুলের ভিতর দিয়ে নোনা ঘাম গড়িয়ে পড়ছে তার রোদ্দুরে ঝলসে যাওয়া মুখের ওপর। পা ফুলে গেছে হাঁটতে হাঁটতে, গায়ের এখানে-সেখানে কেটে ছড়ে গেছে। দু-দন্ড বসে যে জুড়িয়ে নেবে তার উপায় নেই। দেরি হলেই বিপত্তি - জুটতে পারে বকুনি আর চাবুকের মার। সকাল থেকে সাত ঘন্টা খাটুনি হয়ে গেছে, কিন্তু কাজ করতে হবে অন্ততঃ আরো সাত ঘন্টা। সারাদিনে খাওয়া বলতে মাত্র একটা কলা। আর দিনের শেষে তার মত আরো ছেলেদের সাথে গাদাগাদি করে একটা ছোট্ট ঘরে শুতে যাওয়া। সেই ঘর আবার বাইরে থেকে তালা দেওয়া থাকে।

প্রয়োজন হলেও সেই ঘর থেকে কেউ বেরোতে পারবে না...

ভাবছো- এ কার গল্প শোনাতে বসেছি তোমাকে? এত কষ্ট কেন এই ছেলেটার? ওর কি বাবা মা নেই? ও কোথায় কাজ করছে? ওর পিঠের ভারি বস্তায় কি আছে? এ কোন দেশের গল্প?

দেশটার নাম আইভরি কোস্ট। আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের একটা ছোট্ট দেশ। যে দেশে হামেশাই নানা ধরনের যুদ্ধ বিবাদ লেগে থাকে। আইভরি কোস্টের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান। কফি, পাম তেল আর কোকো হল এই দেশের প্রধান ফসল। আইভরি কোস্ট হল পৃথিবীর সবথেকে বড় কোকো উতপাদন ও রপ্তানিকারক দেশ। আশেপাশের অন্যান্য কয়েকটি দেশ - ঘানা, ক্যামেরুন ও নাইজেরিয়ার সাথে মিলে বিশ্বের প্রয়োজনীয় ৭০% কোকো বীন উতপাদন করে।

কোকো গাছ

কোকো দিয়ে কি তৈরি হয়? - এর উত্তর সবাই জানে! - চকোলেট!! ওঃ ভেবেই মুখে জল চলে আসছে, মন খুশি খুশি হয়ে আসছে, তাই না? চকোলেট বা চকোলেট স্বাদের অন্য যেকোন খাবার পছন্দ করে না, এমন মানুষ আমাদের চারিপাশে খুঁজলে মনে হয় পাওয়া যাবেনা। ওই যে প্রথমে আলির কথা বললাম, যে কিনা কাঁধে এক বিশাল বোঝা নিয়ে দিনে চৌদ্দ ঘন্টা কাজ করে, সে আইভরি কোস্টের এক কোকো খামারে কাজ করে। সে ওই খামারের মালিকের কৃতদাস। আর ওর পিঠের ভারি বস্তা ভর্তি হয়েছে গাছ থেকে তোলা কোকো বীনে। যে কোকো দিয়ে তৈরি হয় চকোলেট। যে চকোলেট আলি জীবনে কোনদিন খেয়েই দেখেনি, জানেইনা তার মনভোলানো স্বাদের খবর...

কৃতদাস!! যাঃ! তা আবার হয় নাকি? আজকের দিনে? সে তো সেই কবে 'আঙ্কল টম'স্ কেবিনের' সাথেই শেষ হয়ে গেছে বলেই জানি। আমরা তো তাই ভাবি, আর তাই বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্যি কথা কি জানো, আজকের পৃথিবীতে কিন্তু ক্রীতদাস বা স্লেভস্‌দের সঙ্খ্যা অনেক বেশি। ইন্টারন্যাশনাল লেবর অর্গানাইজেশন (ILO) আমাদের জানাচ্ছে যে প্রায় ১০,০০,০০০ জন শিশু, যাদের বয়স পাঁচ থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে, তারা আইভোরি কোস্টের বিভিন্ন ছোট বড় কোকো খামারে কাজ করে। তাদের বেশিরভাগকেই জোর করে ধরে বেঁধে কাজ করানো হয় এবং অনেকটাই বিনা পারিশ্রমিকে, বা খুব কম টাকার বিনিময়ে। এই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা নানা জটিল যন্ত্রপাতি দিয়ে খামারের কাজ করে, কোন রকম প্রতিরোধ ছাড়াই গাছের গায়ে ছড়ায় নানারকম বিষাক্ত কীটনাশক, যা অনেক সময় তাদেরই ক্ষতি করে। কাজে ক্লান্তি দেখলেই তাদের ওপর চলে অসহ্য অত্যাচার।

কোকো বাগানে কাজ করছে শিশু শ্রমিকরা

এইসব ছোট ছোট শিশুদের পাচার করে আনা হয় আশেপাশের আরো গরিব দেশগুলি - যেমন মালি, বারকিনা-ফাসো- এইসব জায়গা থেকে। খাবার, আশ্রয় আর টাকার লোভ দেখিয়ে মানুষপাচারকারিরা এদের নিয়ে আসে আইভরি কোস্টে, এবং বিক্রি করে দেয় খামার মালিকদের কাছে। কোন কোন ছেলে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যায়। বেশিরভাগই পালাতে পারেনা। যদি বা তারা পালাতে পারে, বা তাদের উদ্ধার করা হয়, তারপরেও তারা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে না। খামারে অমানুষিক অত্যাচারের ফলে আর টানা পরিশ্রম করে করে তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়, আত্মবিশ্বাস একদম নষ্ট হয়ে যায়, তারা আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতেই পারে না।

কিন্তু এই অন্যায় প্রথা আজকের পৃথিবীতে একটা দেশে বা অঞ্চলে চলতে পারে কি করে? ভাবছ নিশ্চয়...। আসলে আগেই বলেছি, আইভোরি কোস্ট খুব উন্নত দেশ নয়। এই দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ আন্তর্জাতিক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে।তার মধ্যে সেখানে নানারকম গৃহবিবাদ লেগেই থাকে। এখানে যারা কোকো চাষ করে, তারে কেউই খুব ধনী বা অনেক জমির মালিক নয়। তারা বেশিরভাগই ছোট এবং মাঝারি মাপের কৃষক। কোকো উতপাদন করার জন্য তারা অনেকটাই নির্ভর করে প্রকৃতির ওপর। মাঝে মাঝে পোকা লেগে গাছ নষ্ট হয়ে যায়। তারা সহজে অর্থ-সাহায্য ও পায়না। তার ওপরে তাদের উতপাদন করা পন্যের সঠিক দাম তারা পায়না। তাই তাদের কাছে খরচা কমানোর সবথেকে সহজ উপায় হল চাষের পেছনে খরচা কমানো। তাই তারা আরো বেশি করে ছোট শিশুদের কাজে নেয়। আলির মত এইসব অসহায় শিশুরা প্রতিবাদ করতে পারেনা, শুধু মুখ বুজে খেটেই চলে। এইখানে একটা কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। এইরকম অন্যায় শিশু-শ্রম শুধুমাত্র আইভোরি কোস্টেই চলে না, পশ্চিম আফ্রিকার একগুচ্ছ ছোট-বড় দেশে চলে। বেনিন, বারকিনা-ফাসো, ক্যামেরুন, টোগো,গাবোন, ঘানা, মালি, নাইজেরিয়া-সমস্ত দেশেই কম বেশি শিশু পাচার ও শিশু-শ্রম

নিয়মিত ভাবে চলে।

সারা বিশ্বের অনেক মানুষই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সরব হয়েছেন। তৈরি হয়েছে ফেয়ারট্রেড (FAIRTRADE), অর্থাৎ কিনা যে সংস্থা পরিচ্ছন্ন উপায়ে, সঠিক দামে কৃষকদের থেকে সরাসরি তাদের ফসল কেনাবেচার দিকে লক্ষ রাখবে।

যে কৃষকরা শিশু শ্রমিক ব্যবহার করেন না, ফেয়ারট্রেড দায়িত্ব নিয়েছে তাদের উতপাদন যথাযোগ্য দামে বিক্রি করে দেওয়ার। কিন্তু যারা বিশ্বের সবথেকে বড় চকোলেট উতপাদনকারি সংস্থা, যেমন ক্যাডবারি, হার্শে, নেস্‌লে বা লিন্ডট, তারা কি করছে? তারা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এখনও অবধি ফেয়ারট্রেডের মাধ্যমে কোকো কিনতে উতসাহী নয়। ইন্টারন্যাশনাল কোকো অর্গানাইজেশন জানাচ্ছে, যে সারা বিশ্বের মোট কোকো উতপাদনের মাত্র ০.১% বিক্রি হয় ফেয়ারট্রেডের মাধ্যমে। অর্থাৎ, পরোক্ষ ভাবে, এইসব সংস্থা গুলি কিন্তু এই শিশু-শ্রম ব্যবহারে মদত দিচ্ছে।

অবশ্য সবাই এইরকম নয়। অস্ট্রেলিয়াতে প্রায় সাতটি সংস্থা আছে, যারা এই ধরনের শিশু-ক্রীতদাসদের দিয়ে উতপাদন করানো কোকো ব্যবহার করেনা। ক্যাডবারি তাদের ব্লগে জানাচ্ছে যে তাদের সবথেকে জনপ্রিয় চকোলেট -'ডেয়ারি মিল্ক' -খুব তাড়াতাড়ি পেতে চলেছে 'ফেয়ারট্রেড'-এর লেবেল।

হয়তো এইভাবেই একদিন ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে মানুষ-পাচার, ক্রীতদাস কেনাবেচা আর শিশুশ্রমের মত অপরাধগুলি। কিন্তু সেই দিনটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি আসতে পারে, তার জন্য আমরা কি কিচ্ছুই করতে পারি না? এরপর যেদিন তুমি তোমার প্রিয় চকোলেট বারে কামড় বসাতে যাবে, তোমার মনে পড়বে না আলির কষ্টের কথা? আলির মত আরো বন্ধুদের অসহনীয় জীবনের কথা? সত্যি করে বলতো, যদি আলিও তোমার চকোলেটে ভাগ বসায়, আর সেই চকোলেট খেতে খেতে তার মুখে ফুটে ওঠে হাসি, মুছে ফেলে চোখের জল, তাহলে কি তুমিও খুশি হবেনা?

সারা বিশ্বে শিশু-শ্রম আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমাদের আশে-পাশে কি আমরা শিশু-শ্রমিক দেখতে পাইনা? তোমার পাড়ার চায়ের দোকানে কাজ করে যে ছেলেটা, বা পাশের বাড়িতে ফাইফরমাশ খাটে যে ছোট্ট মেয়েটা, তারাও তো তোমারই বয়সি, তাদেরও ইচ্ছা করে স্কুলে যেতে, খেলা করতে, চকোলেট খেতে...এইরকম হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আমাদের দেশে কাজ করে রাস্তার ধারের ধাবায়, চায়ের দোকানে, ইঁটভাটায় বা চিংড়ির ভেড়ীতে...সারা পৃথিবী জুড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের, নিজেদের স্বার্থে, নানান অন্যায় কাজে ব্যবহার করে কিছু খারাপ, স্বার্থপর মানুষ। তোমার কি মনে হয়না এইসব খারাপ লোকগুলির কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত?

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী, কলকাতা

ছবিঃইন্টারনেট

লোহারা

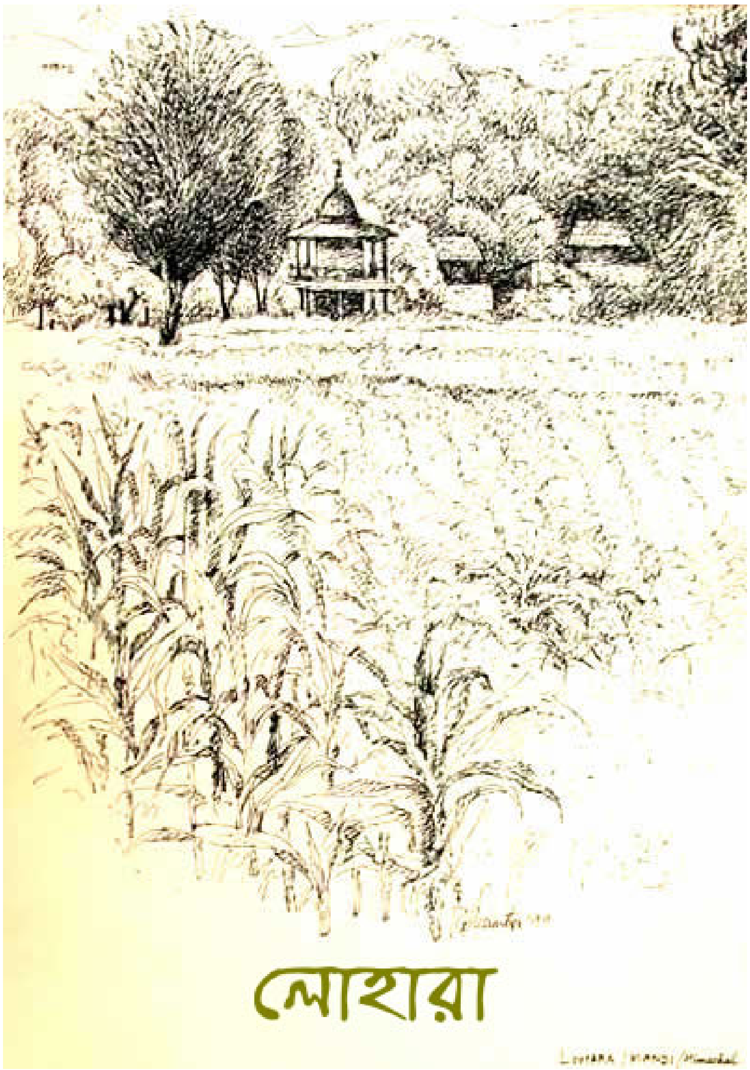

হিমাচল প্রদেশের এক ছোট্ট গ্রাম লোহারা। এই গ্রামের বাসিন্দারা কুলু শাল তৈরির জন্য বিখ্যাত। আমি সেইসব শিল্পীদের সঙ্গে ডিজাইন এবং রঙের ব্যবহার নিয়ে নতুন কাজ করার জন্য সাত দিনের ওয়ার্কশপ করতে গিয়েছিলাম লোহারাতে।

এই গ্রামটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। লোক কথায় বলে, মান্ডির রাজা চিত্রসেন তাঁর ভাইকে এইখানে যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। চিত্রসেন আদতে ছিলেন বাংলার সেন বংশের রাজা। বাংলাদেশ যখন মুসলিম নবাবদের হাতে চলে যায়, তখন চিত্রসেন উত্তর ভারতের দিকে চলে যান। চিত্রসেন ছিলেন ফর্সা, কিন্তু তাঁর ভাইয়ের গায়ের রঙ ছিল কালো। চিত্রসেন মাঝে মাঝেই তাঁর ভাইকে "কয়লা" বলে ক্ষেপাতেন। শেষে একদিন চিত্রসেনের ভাই রেগে গিয়ে তাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করলেন। যুদ্ধের জায়গা স্থির হল এই ছোট্ট গ্রামটি। রাজা আর তাঁর ভাইয়ের সাথে তাঁদের নিজের নিজের সৈন্যবাহিনীও এলো।যুদ্ধের শেষে ভাইকে হারিয়ে যখন চিত্রসেন তার মুন্ডচ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন, তখন, তাঁর ভাই বললেন -"লো হারা" (নাও, হার স্বীকার করলাম)। এই কথা শোনার পর

চিত্রসেন আর তাঁকে মারলেন না।

সেই থেকে এই জায়গার পুরানো নাম মুখে মুখে বদলে হয়ে গেল লোহারা। মানুষ গ্রামটার পুরানো নাম ভুলে গেল।

চিত্রসেন বহুবছর মান্ডিতে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি নানারকম শিল্পকর্মে উতসাহ দিতেন। তিনি উত্তর ভারতে একজন জনপ্রিয় বাঙালি রাজা ছিলেন।

এই লেখার সঙ্গে লোহারা গ্রামের শেষনাগের মন্দিরের একটা ছবি এঁকে দিলাম।

রেবন্ত গোস্বামী
অধ্যাপক
গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফট, কলকাতা

এক্কা-দোক্কা: খেলার দুনিয়ার খুচরো খবর

যা গরম পড়েছে, দিনের বেলা বাইরে খেলতে যাওয়া তো দূরের কথা, স্কুলে যেতেই অবস্থা কাবু, তাই তো? আর বিকেলের দিকেও, সূর্য না ডুবলে স্বস্তি কই? তাই ইচ্ছে না থাকলেও দিনের মধ্যে অনেকটা সময় ঘরের ভেতর থাকতে হচ্ছে। এইরকম ঘরে থাকলেই কিরকম মনে হয় না, ফ্রিজ খুলে মা'কে না জানিয়ে একটু আইসক্রিম খাই, বা এক প্যাকেট চিপস্ কুড়মুড়িয়ে খেয়ে ফেলি? - কি, একদম ঠিক কথা বলেছি তো? আসলে আমারও তো ওইরকম মনে হয়! - তা ঐ আইসক্রিম বা চিপস্ এর সাথে তাল মেলাতে তোমার জন্য এবার এক্কা-দোক্কার পাতায় রইল কিছু খুচরো খবর--- খেলার জগতের নানার মজাদার তথ্য।

ফুটবল খেলার আরেক নাম 'সকার' কেন?

-'সকার' (soccer) শব্দটা আসলে এসেছে ইংল্যান্ড থেকে। সত্যি বলতে কি, ইংল্যান্ডেই আধুনিক ফুটবল খেলার গোড়াপত্তন হয়। ইংল্যান্ডে দুই রকমের ফুটবল খেলা হত - রাগবি ফুটবল আর অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল। রাগবি ফুটবল খেলাকে ছোট করে বলা হত 'রাগার' আর অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলকে বলা হত 'অ্যাসক'। এই 'অ্যাসক' ই মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে আরো সহজ শব্দ -'সকার' হয়ে যায়! অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল পরে যখন আমেরিকাতে চালু হয়, তখন প্রথম থেকেই 'সকার' নামে পরিচিত হয়।

খেলার দুনিয়া দ্রুততম বস্তুগুলির মধ্যে একটা হল ব্যাডমিন্টন খেলার শাট্‌ল্। একটা উড়ন্ত শাট্‌ল্ এর

গতি ঘন্টায় ১৮০কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

আধুনিক ব্যাডমিন্টন খেলার জন্ম কিন্তু বৃটিশ ভারতবর্ষে! সেই সময়ে ইংল্যান্ডের এক জনপ্রিয় খেলা ছিল ব্যাটলডোর অ্যাণ্ড শাটল্‌কক। এই খেলায় ব্যবহার হত ছোট র‍্যাকেট, যাকে বলা হত ব্যাটলডোর। ভারতে বসবাসকারি বৃটিশরা এই খেলায় দুইদলের মাঝখানে একটা নেট বা জাল লাগিয়ে নেন। এই খেলা সবথেকে জনপ্রিয় ছিল বৃটিশ ভারতের সেনাবাহিনীর অন্যতম অবস্থান পুনা শহরে। তাই এই খেলার আরেক নাম ছিল 'পুনা'। অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ অফিসাররা দেশে ফেরত যাওয়ার সময় এই খেলাও নিয়ে যান। তখন এই খেলার নিয়ম কানুন কাগজে-কলমে তৈরি হয়। ১৮৭৩ সালে, গ্লস্টারশায়ার-এর ব্যাডমিন্টন হাউসে এই খেলা আধুনিক রূপে শুরু হয়, এবং তখন থেকে ব্যাডমিন্টন নামে পরিচিত হয়।

সারা বিশ্ব জুড়ে টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে স্পোর্টস্‌ বা খেলার অনুষ্ঠান এর দর্শক সংখ্যা

সবথেকে বেশি। সামার অলিম্পিক্স, বিশ্বকাপ ফুটবল আর ফর্মূলা ওয়ান রেসিং দেখেন সবথেকে বেশি সংখ্যক দর্শক।

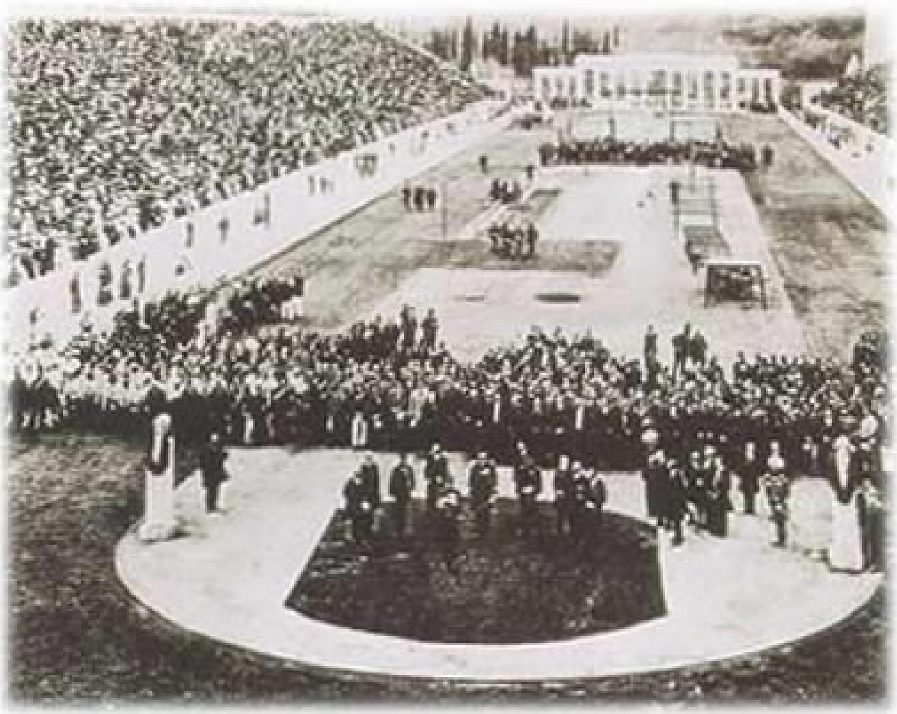

প্রথম আধুনিক অলিম্পিক গেমস্ খেলা হয় গ্রীসে, ১৮৯৬ সালে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ৩১১ জন পুরুষ প্রতিযোগি, কিন্তু কোন মহিলা যোগ দেন নি।

প্রাচীন অলিম্পিকে জয়ীদের জন্য পুরষ্কার ছিল অলিভ পাতার মুকুট, সোনা বা রূপো নয়। যখন আধুনিক অলিম্পিক শুরু হল, তখন জয়ীদের দেওয়া হত রূপোর মেডেল। আট বছর পরে, সেন্ট লুইস অলিম্পিকে, প্রথম সোনার মেডেল এর প্রচলন হয়। আজকাল যে সোনার মেডেল দেওয়া হয়, সেগুলি আদতে সোনার পরত দেওয়া স্টার্লিং রূপোর মেডেল।

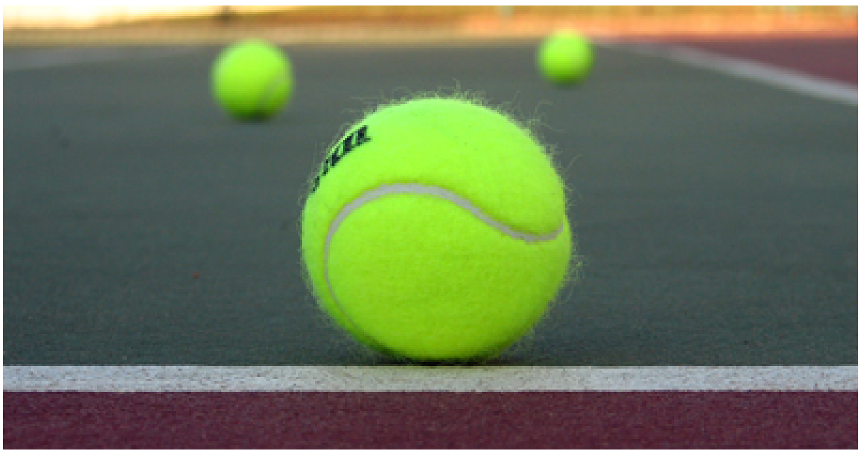

উইম্বলডন্ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রায় ৬৫০ টি ম্যাচ খেলা হয়। এই খেলাগুলিতে সব মিলিয়ে প্রায় ৪২,০০০

বল ব্যবহার করা হয়।

একটি বেসবলের বলে সবসময় ১০৮টি ফোঁড় থাকে, ক্রিকেট বলে থাকে ৬৫-৭০টি, আর ফুটবলে থাকে ৬৪২টি ফোঁড়।

তথ্য সংকলনঃ
মহাশ্বেতা রায়
পাটুলী, কলকাতা

আঁকিবুকি

চিন্ময়ী ভট্টাচার্যি, ৪ বছর, উলান বাটার, মঙ্গোলিয়া

সৃজনী ঘোষ, চতুর্থ শ্রেনী,বি ডি মেমোরিয়াল স্কুল, কলকাতা

পালা-পার্বন

এই সংখ্যা থেকে শুরু হল ইচ্ছামতীর নতুন বিভাগ -পালা-পার্বন। কি থাকবে এই পাতায়? এখানে চোখ বুলিয়ে আমরা চট করে জানতে পেরে যাব বাংলার নিজস্ব পালা-পার্বনের দিন-তারিখ গুলি। তার সাথে পেয়ে যাব আমাদের কিছু জাতীয় উতসবের দিন-তারিখ, এবং কিছু আন্তর্জাতিক ভাবে পালিত বিশেষ দিনের খোঁজ। যেহেতু বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় এবং সামাজিক উতসবগুলি বাংলা মাসের দিন-ক্ষণ মেনে পালন করা হয়, আবার সাথে সাথে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিন বা উতসব গুলি ইংরাজি তারিখ মেনে পালন করা হয়, তাই ইচ্ছামতীর এই নিজস্ব ক্যালেন্ডারে, বাংলা এবং ইংরাজি দিন হাত ধরাধরি করেই থাকবে।

এই বিভাগ শুরু হল আগামি দুই-তিন মাসের বিশেষ দিনগুলির তালিকা দিয়ে। আমরা ধীরে ধীরে এই তালিকাটিকে বড় করে তুলবো।

২৫শে বৈশাখ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন
১লা জৈষ্ঠ্য - অক্ষয় তৃতীয়া
৭ই জৈষ্ঠ্য -রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব দিবস
১১ই জৈষ্ঠ্য -কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন
১২ই জৈষ্ঠ্য -বুদ্ধ পূর্নিমা
১৩ই আষাঢ় - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন
১৪ই আষাঢ় - স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন
১৬ ই আষাঢ়/১লা জুলাই- ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন
২১শে আষাঢ় -শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন
২৮শে আষাঢ়- রথযাত্রা উতসব
৩রা শ্রাবন - উলটো রথ

১লা মে -শ্রমিক দিবস (May Day; Labour Day)
১৫মে- বিশ্ব পরিবার দিবস (International Day of Families)
৫ই জুন - বিশ্ব পরিবেশ দিবস (World Environment Day)
১৪ই জুন- বিশ্ব রক্তদাতা দিবস (World Blood Donor Day)
১৭ই জুন- বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস (World Day to combat Desertification and Drought)
২০ জুন- বিশ্ব গৃহহীন দিবস (World Refugee Day)